শেষ অবধি

প্রণব ভট্ট

‘সময় বেশি নাই।’ আকবর হাসিমুখে বলে।

আকবর একটু কাত হয়ে শুয়ে আছে। আসলে শুয়ে আছে না বলে বলা উচিত, সে মাটিতে পড়ে আছে। তাকে ঘিরে আছে গ্রামের লোকজন। তার একদম মাথার কাছে বসে আছেন গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার নাসেরুজ্জামান। তিনি আকবরের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। এদিকে-ওদিকে মানুষের অস্পষ্ট হইচই। যত দূর চোখ যায় দূরে ও কাছে, চোখে পড়ে হারিকেন হ্যাজাক আর টর্চের আলো। আকবর আবারও বলে, ‘সময় বেশি নাই।’

উপস্থিত প্রায় সবার মুখে হাহাকার ধ্বনি শোনা যায়। হেডমাস্টার নাসেরুজ্জামান কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন, ‘তুই বাজে কথা বলিস না রে বাপ।’

‘বাজে কথা না স্যার।’ আকবর হাসে। ‘এইটা তো আপনেও বুঝতেছেন। বুঝতেছেন না, কন ?’

নাসেরুজ্জামান ঝট করে চোখের জল মুছে নিয়ে দুপাশে মাথা নাড়েন। অর্থাৎ তিনি বুঝছেন না।

আকবর আবার হাসে। ‘আমি বুঝতেছি।’

‘তুই চুপ। একদম চুপ। একটাও কথা বলবি না।’

‘কথা না কইলে কী হইব ?’

‘আরে, চুপ কইতাছি। ডাক্তার এই এখনই আইসা পড়ব।’

‘স্যার, ডাক্তাররা সব সময় দেরি কইরা আসে। দেখছি তো, ওই যে একবার আসিরুদ্দিন...।’

‘আহা রে বাপ ! তুই এত কথা কেন বলিস ?’

‘কথা কি আমি কোনো সময় কম বলছি ?’

নাসেরুজ্জামান কিংবা উপস্থিত আর কেউ আকবরের এ কথার উত্তর দেয় না।

‘আমি স্যার এত কথা কইতাম যে সবাই আমার কথা শুইনা বিরক্ত হইত।’

নাসেরুজ্জামান এবং উপস্থিত আর সবাই চুপ করে থাকেন। কারো কারো মাথা নিচু হয়ে যায়। নাসেরুজ্জামান চোখ মুছে নিয়ে আকবরের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

‘সবাই আমারে কইত পাগলা।’

‘না, মিথ্যা কথা। কেউ তোকে পাগলা বলত না।’

‘কইত। শুইনা মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ হইত।’

‘আহা...!’

‘আবার কখনো কখনো কিন্তু মজা পাইতাম।’

‘বাপ, তুই কি একটু চুপ করবি বাপ ? তোর কষ্ট হইতেছে না ?’

‘হইতেছে তো।’

‘তাইলে চুপ কইরা থাক।’

‘আবার ধরেন, কষ্ট হইতেছেও না।’

‘এইটা আবার কী কথা ?’

‘সারা জীবন এত কষ্ট পাইছি, তার কাছে এই কষ্ট কিছুই না।’

ব্যস, আকবরের কথায় উপস্থিত সবার মাথা আবার নিচু হয়ে যায়।

আকবর আবারও বলে, ‘এখন স্যার মজা পাইতেছি। এখন আমার মনে খুবই আনন্দ, হ।’

লতিফপুর গ্রামে আকবরকে সবাই চেনে পাগল হিসেবে। তার মাথায় গোলমাল, কখন কী বলে তার কোনো ঠিক নেই। এই তো কিছুদিন আগে এলাকার চেয়ারম্যান হাবিবুল্লাহকে সে এমন একটা কথা বলে বসে। হাবিবুল্লাহ এখানে এসেছিলেন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হয়ে।

লতিফপুর গ্রামে একটার পর একটা অনুষ্ঠান লেগেই থাকে।

কখনো ফুটবল ম্যাচ হয়, ইদানীং ক্রিকেট খেলাও হচ্ছে, তা ছাড়া গ্রামীণ খেলা তো আছেই। আর আছে বছরে দুবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তা, এবারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় সংশ্লিষ্ট সবাই ঠিক করল, অনুষ্ঠানটা করতে হবে বেশ মজাসে, জাঁকজমকের সঙ্গে। জাঁকজমকের সঙ্গে মানে, আরো বড় করে। বছরের শেষ অনুষ্ঠান এটা। সাধারণত দু দিন ধরে হয় এই অনুষ্ঠান; ঠিক হলো, এবার হবে তিন দিন। প্রতিবছর হয় একটা নাটক, ঠিক হলো এবার হবে দুটো। একটা হবে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক নাটক। এর প্রস্তাবক স্কুলের হেডমাস্টার নাসেরুজ্জামান। তিনি বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধ নিয়া নাটক করা উচিত, এইটা আমাদের কর্তব্য।’

সমস্যা হলো, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক যে করা হবে, কোন নাটকটা করা হবে, আর নাটকটা লিখবেই বা কে ! এত অল্প সময়ের মধ্যে কে-ইবা লিখে দেবে মুক্তিযুদ্ধের নাটক ! এমন তো নয় যে এ গ্রামে কোনো নাট্যকার আছে।

এই সমস্যার কথা আকবরের কানে এলে সে আর দেরি করে না, বলে, ‘এইটা কুনো চিন্তার বিষয়ই না। এইটা হইতেছে পানির মতন সহজ ব্যাপার।’

স্কুলে বসে কথা হচ্ছিল। আকবরের ওখানে থাকার কথা নয়। তবে সে এদিক-ওদিক করে ঠিকই ঢুকে পড়ে। তার কথা শুনে সবাই তার দিকে তাকায়। তারপর ‘পাগলের কথা’ ভেবে আবার নিজেদের আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আকবর বলে, ‘আমি যে একখান কথা কইলাম, কেউ কি শুনল না ?’

গ্রামের অধিকাংশ মানুষই তার ওপর বিরক্ত। পাগলের ওপর তো সন্তুষ্ট হয়ে থাকার কোনো কারণ নেই। শুধু হেডমাস্টার নাসেরুজ্জামান তাকে পছন্দ করেন, আর অল্পবিস্তর পছন্দ করেন আফাজউদ্দিন, শেখ নিয়ামত, আমানুল– এরা।

আমানুল প্রশ্ন করেন, ‘এই, তুই কি কিছু কইবি ?’

‘কইলাম তো। এইটা হইতেছে পানির মতন সহজ একটা ব্যাপার।’

‘কী রকম সহজ ?’

‘আপনারা কইলে নাটক আমিই লেইখা দেই।’

‘তুই নাটক লিখবি ?’

‘সহজ কাজ। বাবার কাছ থেইকা মুক্তিযুদ্ধের কত গল্প হুনছি !’

মিটিংয়ে উপস্থিত সবাই এমন খেপে যায় যে হেডমাস্টার নাসেরুজ্জামান তাদের সামলাতে পারেন না। ব্যস, সবাই দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয় আকবরকে। তাতে অবশ্য আকবরের কিছুই এসে-যায় না। কারণ বহুদিন থেকেই সে ধমক খেয়ে আর নানা রকম কথা শুনে অভ্যস্ত। ফলে দিন দুই পরই সে আরেকটা প্রস্তাব দেয়। বলে, ‘ঠিক আছে, নাটক নাহয় আমি না-ই লিখলাম, আপনারাই লেখেন। কিন্তু নায়কের পাট আমার। এইটা ফাইনাল।’

আবারও ধমক খেতে হয় আকবরকে। তবে সে নাছোড়বান্দা। অভিনয় সে করবেই করবে। এটা নাকি তার অনেক দিনের শখ। এমন একটা সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, সেটা সে হাতছাড়া করতে নারাজ। তার কথায় কেউ গুরুত্ব দেয় না। কারণ, পাগল অনেক কিছুই বলে। যথারীতি নাটকের অনুশীলন চলতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক, হাসান জামানের লেখা। সে এই গ্রামের কেউ নয়। পাশের শহরের নাট্যকর্মী। নাটক নিয়ে তার প্রচণ্ড কৌতূহল। ঢাকা শহরে সে বেশ কয়েকটা প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছে। এবং ঢাকাকেন্দ্রিক নাটকের একটি বড় দল তাকে গ্রাম পর্যায়ে কাজ করতে বলেছে। তারই অংশ হিসেবে সে লতিফপুরে কাজ করতে এসেছে। বাইরের লোক বলে গ্রামবাসীর ভেতর একটা ইতস্তত ভাব ছিল। কিন্তু হাসান জামানের কাজ দেখে তারা খুবই সন্তুষ্ট। তাদের এ রকম ধারণা হয়েছে, একটা ভালো নাটক তারা হয়তো করতে যাচ্ছে।

কিন্তু আকবরের ধারণা এ রকম নয়। কারণ, যে নাটকে তাকে অভিনয় করতে নেয়া হয়নি, সেটা কী করে ভালো নাটক হয়, এটাই সে বুঝতে পারছে না। সে অবশ্য লেগে আছে। হয়তো রিহার্সেল চলছে নাটকের। রিহার্সেল রুমে কারো ঢোকাই নিষেধ, কিন্তু আকবর জোর করে ঢুকে পড়ল, হাসান জামানকে জিজ্ঞেস করল, ‘ভাই, ও ভাই, কিছু ঠিক করলেন?’

হাসান জামানের হয়েছে বিপদ। এভাবে একজন বিরক্ত করলে ঠিকমতো কাজ করা যায় ! তবে হ্যাঁ, তারপরও সে আকবরকে কিন্তু পছন্দ করে ফেলেছে। রিহার্সেল রুমের আর সবাই যখন মারমুখো হয়ে ওঠে, তখন হাসান জামান যতটা সম্ভব সহানুভূতির সঙ্গে আকবরের ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করে।

‘কী ঠিক করব, বলো তো ? তোমার অভিনয়ের ব্যাপারটা ?’

‘জি। ব্যাপার তো এখন এই একটাই।’

‘ভাই আকবর, তোমাকে নিতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম। কিন্তু তুমি তো অভিনয় জানো না।’

‘আমি !’ আকবর অবাক গলায় বলে, ‘আমি অভিনয় জানি না !’

‘তোমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে।’

‘আরে, সুযোগ না দিলে শিখমু কেমনে ?’

‘তাও ঠিক। আচ্ছা, তুমি এই সংলাপটা বলো, ধরো, তুমি একজন মুক্তিযোদ্ধার ছেলে, বীর মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু অখ্যাত, তার জীবনে প্রাপ্তি বলে কিছুই নেই...।’ এভাবে হাসান জামান বুঝিয়ে দেন ব্যাপারটা, তারপর বলেন, ‘নাও, এবার সংলাপটা বলো।’

আকবর হাত-পা নেড়ে এমনভাবে সংলাপ বলতে আরম্ভ করে, রিহার্সেল রুমের সবাই তো একেবারে হো-হো করে হেসে ওঠে।

খেপে যায় আকবর। ‘এর মইদ্যে এত হাসির কী হইল ? আমার অভিনয় হয় নাই ?’

হাসান জামান হাসি চেপে বলে, ‘আমি একটা কথা বললে তুমি আমার ওপর রাগ করবে না তো ?’

আকবর বলে, 'না, করমু না, কন।'

'তোমার অভিনয় হয়নি।'

'এ। আপনেও ওই দলে !'

'আমি কোনো দলে না। তবে তুমি যদি অভিনয় শিখতে চাও, পরে তোমাকে শেখাব।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আকবর বলে, 'ঠিক আছে, শিখায়েন।'

এই বলে রাগে, দুঃখে, অভিমানে আকবর রিহার্সেল রুম থেকে হনহন করে বের হয়ে যায়। আর এক দিনও সে রিহার্সেল রুমে আসে না। তবে যেদিন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এই নাটকটা হবে বলে ঠিক, সেদিন সে নাটকটা দেখার জন্য ঠিকই এসে হাজির হয়।

বিশাল আয়োজন। শুধু লতিফপুর নয়, আশপাশের আরো কয়েক গ্রামের মানুষ এসে হাজির হয়েছে। মাঠটা বিশাল, নইলে এত লোকের ব্যবস্থা করাই মুশকিল। উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ আসেন প্রধান অতিথি হয়ে। এই হাবিবুল্লাহকে আকবর বলে, 'আরে, এই রকম একটা অনুষ্ঠানে আপনেরে ক্যান প্রধান অতিথি বানাইল, এইটা তো আমি বুঝতেছি না !'

হাবিবুল্লাহরও যে স্বভাব-চরিত্র, এ ধরনের নানা কথা পরোক্ষভাবে তাকে শুনতে হয়। তাই বলে এমন একটা পুচকে ছেলে সরাসরি এ কথা বলবে !

আকবরকে যখন অভিনয়ের সুযোগ দেয়া হয়নি, তখন সে নিয়েছে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব। এই দায়িত্বও তাকে দিতে অনেকেই আগ্রহী ছিল না। পাগল, স্বেচ্ছাসেবকের কাজ কী করবে, ওটা কি সহজ কোনো ব্যাপার ! এ ব্যাপারে আকবর কিন্তু নাছোড়বান্দা।

সে সরাসরি হুমকি দিল, তাকে যদি স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্বও পালন করতে না দেয়া হয়, তবে সে দেখে নেবে। এমন সব কাণ্ড ঘটাবে, পুরো অনুষ্ঠানই পণ্ড হয়ে যাবে। তখনই কেউ কেউ বলে, ওকে অনুষ্ঠানের দিন হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হোক। অনেকেই এতে রাজি– হ্যাঁ, ওটাই ঠিক হবে। আবার কেউ কেউ বলে, আচ্ছা, ওকে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব দিলে কী এমন অসুবিধা ! আর স্বেচ্ছাসেবক তো ও একাই থাকছে না, আরো অনেকেই থাকছে। আরো অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে ও নিশ্চয়ই দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

আকবর শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পায়। তাকে বলা হয় দর্শক-শ্রোতাদের বসানোর দায়িত্ব নিতে। কিন্তু সে বলে দেয়, মঞ্চের পাশ থেকে সে একচুলও সরবে না। কারণ, এখানেই বড় দায়িত্ব, আর বড় দায়িত্বই সে পালন করতে চায়। তা ছাড়া মঞ্চের পাশে থাকলে কে কেমন অভিনয় করবে, এটাও সে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাবে এবং পরে এ ব্যাপারে বলতে পারবে।

সুতরাং সে মঞ্চের পাশ থেকে সরে না। এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো অঘটনও সে ঘটায় না। তাই বলে কোনো কাজও অবশ্য করে না। শুধু মাথায় ক্যাপ আর বুকে ব্যাজ লাগিয়ে মঞ্চের সামনে ভাব নিয়ে হাঁটাচলা করে আর মাঝে মাঝে গম্ভীর মুখে এদিক-ওদিক তাকায়।

ঘটনা ঘটে অনুষ্ঠান শেষে। হাবিবুল্লাহ বিদায় নেবেন, সবাই তাকে ঘিরে আছে, আর হাবিবুল্লাহ বলেছেন, 'অনুষ্ঠান ভালো হইছে, হুঁ, এক নাম্বার হইছে', এমন সময় ভিড় ঠেলে আকবর ঢুকে পড়ে। হাবিবুল্লাহ অবশ্য তখন তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছেন, আকবর তখনই বলে, 'স্যার, আমার একখান কোশ্চেন ছিল। অ্যানসার কি দিবেন ?'

আকবরের ভাবভঙ্গি হাবিবুল্লাহর পছন্দ না হওয়ায় তিনি স্বভাবতই ভ্রূ কুঁচকে তাকান। কিছুই বলেন না।

আকবর বলে, 'আরে, এই রকম একটা অনুষ্ঠানে আপনেরে ক্যান প্রধান অতিথি বানাইল, এইটা আমি বুঝতেছি না তো!'

হাবিবুল্লাহর এক চামচা আকবরকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে চায়। হাবিবুল্লাহ তাকে সামলে আকবরের দিকে

তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কে ?'

আকবর বলে, 'আমি স্বেচ্ছাসেবক। বুঝছেন ?'

'তা আমারে প্রধান অতিথি বানাইলে তোমার কী অসুবিধা ?'

'আমার আর কী অসুবিধা ! অসুবিধা তো অন্য জায়গায়।'

'কোন জায়গায় ?'

'এইসব অনুষ্ঠান আপনে কি বুঝেন ? এই যে একটা নাটক হইল, কিছু বুঝছেন ?'

গ্রামের গণ্যমান্য লোকজন ততক্ষণে আকবরকে টানতে টানতে অন্যদিকে নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। হাবিবুল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'এইটা কে ?'

লোকজন বলে, 'এইটা একটা পাগল। চেয়ারম্যান সাব, দয়া কইরা এইটার কথা আপনে কানে নিবেন না।'

আকবর চেঁচিয়ে ওঠে, 'পাগল আমি না, পাগল হইতেছেন আপনারা। পাগল আপনারা না হইলে যে কিনা রাজাকার, যুদ্ধের সময় মানুষ মারছে, এমন একটা মানুষরে আপনারা কী কইরা মুক্তিযুদ্ধের নাটকের দিন প্রধান অতিথি বানাইলেন !'

হাবিবুল্লাহ সামান্য সময়ের জন্য কঠিন চোখে তাকান। তবে আকবর যে পাগল, সেটা শুনে কিছুটা স্বস্তিও পান। আর দাঁড়ান না তিনি। 'ওইটারে ধইরা কিছু প্যাঁদান দাও, তাইলে যদি পাগলামি কমে' বলে হনহন করে চলে যান। ব্যস, যা হওয়ার তা-ই হয়। লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ সত্যি আকবরকে মারতে আরম্ভ করে।

আকবরের মার খেয়ে অভ্যাস আছে। ছোটবেলা থেকে কতজন কতভাবে মেরেছে তাকে ! কেউ সামান্য কারণে, কেউ খামোখা। আর পাগল বলে খ্যাতি তো আছেই। মাথায় সামান্য গোলমাল তার আছে, এটা সে নিজেই স্বীকার করে। তবে তাই বলে সে পাগল, এটা সে স্বীকার করে না। সে বলে, তার সমস্যা হচ্ছে সব জায়গায় সে সত্য কথাটা বলে ফেলে। এই যেমন হাবিবুল্লাহকে বলল, তারপর মার খেল।

মার খাওয়া আকবরকে সান্ত্বনা দিতে বা দেখতে কেউ এল না। রাতে একমাত্র নাসেরুজ্জামান এলেন আকবরকে দেখতে।

আকবর থাকে তার ফুফুর সঙ্গে। ফুফুর বয়স হয়েছে বেশ, বিধবা মহিলা, কাজকর্ম বা জমিজমা তেমন কিছু নেই। ফলে তাদের দুজনের সংসারে অভাবও খুব। মাঝে মাঝে কাজের খোঁজে গঞ্জে যায় আকবর। তবে গঞ্জেও তাকে সবাই জানে। সুতরাং কে তাকে কাজ দেবে ! তাই না-চলার মতো চলে তাদের সংসার, কোনো রকমে, টেনেটুনে।

হেডমাস্টার নাসেরুজ্জামান যখন এলেন, আকবর তখন দাওয়ায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। সে নাসেরুজ্জামানকে দেখে, কিন্তু কিছুই বলে না। নাসেরুজ্জামানই তার পাশে বসতে বসতে বলেন, 'তোর মাথা এখন কি ঠাণ্ডা, না গরম ?'

আকবর হাসে। 'কথাটা তো কইয়া ফেলছি। এখন মাথা ঠাণ্ডা, আগে গরম ছিল।'

'বুঝলাম। কিন্তু কথাটা বলে কী লাভ হইল ?

'এইটা কী কন স্যার ! সব সময় লাভ-ক্ষতির বিচার করলে চলে ?'

'তারপর যে মার খেলি ?'

'খাইলাম।'

'ব্যথা পাইছস ?'

‘পাই নাই আবার ! খুব মারছে তো।’

‘একা একা বসে আছিস কেন ?’

‘আছি।’

‘সত্যি করে বল, কী ভাবছিস ?’

‘ভাবনের আছে কী !’ আকবর সামান্য হাসে। ‘বাপজানের কথা মনে পড়তেছে।’

নাসেরুজ্জামান কিছু বলেন না।

আকবরই বলে, ‘স্যার, আমার মাঝে মইদ্যেই একটা কথা খুব মনে হয়।’

‘কী ?’

‘আমার বাপজান অত বড় মুক্তিযোদ্ধা ছিল, কিন্তু আমি জীবনে কিছুই হইতে পারলাম না।’

‘আরে পাগল...।’

‘আমার মাঝে মইদ্যে খুব মুক্তিযোদ্ধা হইতে ইচ্ছা করে।’

নাসেরুজ্জামান কিছু বলেন না। তিনি আকবরের কাঁধে একটা হাত রাখেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

আকবরের বাবা রহিমউদ্দিন ছিলেন নামকরা মুক্তিযোদ্ধা। খুব সম্পন্ন অবস্থা ছিল না। কিছু কৃষিজমি ছিল। বাবার সঙ্গে সেই জমিতে কাজ করতেন রহিমউদ্দিন। দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়া বেশি দূর করার সুযোগ হয়নি।

রহিমউদ্দিনের বয়স যখন ২৩/২৪ তখনই দেশে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। তাদের গ্রাম সীমান্তের কাছাকাছি তারা দেখেন তাদের গ্রামের ওপর দিয়েই হাজার হাজার মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছে। তাদের মুখে পাকবাহিনীর নানা অত্যাচারের কাহিনীও শুনতে পান তারা। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর পাকবাহিনী তাদের গঞ্জে এসে উপস্থিত হয়। একের পর এক আশপাশের গ্রাম পুড়িয়ে দিতে থাকে, মুক্তিবাহিনীর লোক বলে যাকে-তাকে ধরে নিয়ে যায়, যাকে-তাকে গুলি করে মেরে ফেলে। সব দেখে-শুনে রহিমউদ্দিনের মনে হয়, না, আর বসে থাকা যায় না, দেশের জন্য এবার যুদ্ধ করা উচিত। এখন তিনি যদি দেশের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে না নেন, সেটা হবে অন্যায়।

রহিমউদ্দিন যুদ্ধে যান। তাদের গ্রাম থেকে সীমান্ত দূরের পথ নয়। এক দুপুরে তিনি রওনা দেন, হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যান সন্ধ্যার আগেই।

যুদ্ধ শুধু করেনই না, যুদ্ধে খুব নামও করেন রহিমউদ্দিন। এত নাম করেন যে, তার কথা জেনে যায় অন্যান্য সেক্টরের অনেক যোদ্ধাও। প্রবল সাহস ছিল তার আর ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। সাহসের কারণে কখনো বাড়াবাড়ি করে ফেললেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি ঠিক বিপদ থেকে বের হয়ে আসতে পারতেন। তার লড়াই করার ক্ষমতা দেখে তাই কমান্ডার একদিন বলেই ফেলেন, ‘রহিমউদ্দিনকে দেখে মনে হয় সে মায়ের পেট থেকেই যুদ্ধ শিখে এসেছে !’ শুনে রহিমউদ্দিন হাসতেন আর পরের লড়াইটা করতেন আরো বিক্রমের সঙ্গে।

যুদ্ধ একদিন শেষ হয়। দেশ ঠিকই স্বাধীন হয়। রহিমউদ্দিন বিজয়ীর বেশে গ্রামে ফিরেও আসেন। লতিফপুরে তাকে নিয়ে যেন মেলা বসে যায়। মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাতে শোনাতে রহিমউদ্দিন যেন অস্থির হয়ে পড়েন। গল্প কত আর শোনানো যায় !

তাই বলে গল্প শোনানোর হাত থেকে কিন্তু নিস্তার পান না রহিমউদ্দিন। এ গ্রামের লোকজন একসময় গল্প শোনা বন্ধ করে দেয়। সেটা অবশ্য বিজয়ের কিছুদিন পর থেকেই। তারপরও কেউ কেউ আসে মাঝে মাঝে। যুদ্ধের কথা শুনতে চায়। এর মধ্যে নানা ঘটনা ঘটে যায়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে আর ইচ্ছে করে না

রহিমউদ্দিনের। তিনি যুদ্ধে গিয়েছেন, লড়াই করেছেন, দেশ মুক্ত করেছেন এবং ফিরে এসেছেন, ব্যস, এই হচ্ছে ব্যাপার। এভাবে নানা জনকে এড়িয়ে যেতে পারলেও আকবরকে তিনি কখনো এড়িয়ে যেতে পারেন না। সেই ছোটবেলা থেকে আকবরের এক কথা, 'বাজান, গল্প শোনাও।'

রহিমউদ্দিন বলতেন, 'ভূতের গল্প শুনামু ? মামদো ভূতের ? রাক্ষসের ?'

আকবর বলত, 'আমারে তুমি শুধু মুক্তিযুদ্ধের গল্প কও।'

'এইটা শুইনা তুই কী করবি ?'

'কী করমু, এইটা তো আমি কইতে পারি না বাজান। তবে এই গল্প আমার শুনতে ইচ্ছা করে।'

'না রে বাপ, এই গল্পে এহন আর কুনো মজা নাই।'

'মজার দরকার নাই। আমি কইছি, আমারে তুমি মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাও, ব্যস।'

আকবরের ছিল জেদ। প্রচণ্ড জেদ। সে যা চাইত বা বলত, ওই অনুযায়ী কাজ না হলে হয় অভিমানে গাল ফুলিয়ে বসে থাকত, নয় তো কান্নাকাটি জুড়ে দিত। তার বাবা রহিমউদ্দিন মাঝে মাঝে বলতেন, 'তোরে একখান কথা কই বাজান ?'

'কও।'

'এত জেদ থাকন ভালা না।'

'ক্যান ?'

'হ, এত জেদ, এত অভিমান থাকন ভালা না।'

'ক্যান ?'

'পরে তাইলে কষ্ট পাইতে হয়।'

ওই বয়সে এ ধরনের কথা আকবরের বুঝতে পারার কথা নয়। সে বুঝতে পারেও না। তবে বাবাকে সে জিজ্ঞেস করে, 'এই কথা ক্যান কও বাজান ?'

'আমি তো কষ্ট পাইছি বাজান। তাই কই।'

'ক্যান কষ্ট পাইছ ?'

'পাইছি। এহন বুঝবা না বাজান। বড় হইলে যদি বোঝো।'

'ঠিক আছে। তুমি তাইলে এহন আমারে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাও।'

মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাতে রহিমউদ্দিনের ইচ্ছে করত না। নানাভাবে তিনি আকবরকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। যখন পারতেন না, তখন কী আর করা, ইচ্ছে না থাকলেও গল্প শোনাতেন। সাধারণত রাতেই মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনানোর ব্যাপারটা ঘটত। সারা দিন কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকেন রহিমউদ্দিন। রাতেই তার সময়। সে সময় গল্প যদি তিনি শোনাতে আরম্ভ করতেন, দেখা যেত– যদিও তিনি আরম্ভ করতেন অনিচ্ছা নিয়ে, তবে ধীরে ধীরে নিজেই উৎসাহী হয়ে উঠতেন। ক্রমশ তার ভেতর আবেগ বৃদ্ধি পেত। কী হতো কে জানে, তিনি যেন এক ঘোরের মধ্যে চলে যেতেন। একের পর এক মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলে যেতেন। এমনও হয়েছে, অনেক রাতে গল্প শুনতে শুনতে আকবর তার বাবার কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে এটা ঠিক, আকবর জেগে থাকত অধিকাংশ দিন। আর নানা রকম প্রশ্নে সে তার বাবার ঘোর কাটিয়ে দিত।

'বাজান, ওই যে মরল না খানসেনা, গুলিটা তুমিই করছিলা ?'

'হ বাজান। আমিই করছিলাম।'

‘যত খানসেনা ছিল, সবগুলারে তো তুমিই মারছ ?’

‘না রে বাজান, আমি কি একা মারছি ? আরো অনেক যোদ্ধা ছিল।’

‘অ, ঠিক আছে। তুমি তো অনেকগুলারে মারছ, তাই না ?’

‘হ বাজান, আমি অনেকগুলারে মারছি।’

‘শাবাশ ! কও, এহন গল্পের বাকিটা কও।’

গল্প শেষ হলে প্রতিবার আকবর একটা কথা বলত। সে বলত, ‘বাজান, আমি কী ঠিক করছি, জানো ?’

রহিমউদ্দিন জানতেন আকবর কী করবে, তবু তিনি ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতেন, ‘না বাজান, জানি না।’

‘শুনবা ?’

‘শুনুম না ক্যান ! তুমি কও।’

‘আমি ঠিক করছি বড় হইয়া আমি মুক্তিযোদ্ধা হমু।’

‘মুক্তিযোদ্ধা হইবা !’

‘হ বাজান। মুক্তিযোদ্ধার ছেলেরে তো মুক্তিযোদ্ধাই হইতে হইব।’

প্রতিবার এই কথাই বলে আকবর, আর রহিমউদ্দিনের চোখে পানি এসে যায়। তিনি চোখ মুছে আকবরের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। কোনোমতে কায়ক্লেশে। তাদের সংসারে অভাব ছিল কিন্তু কোনো অশান্তি ছিল না। নুন আনতে পান্তা ফোরানো টেনেটুনে চলা অনটনের সংসারেও তারা বলা চলে সুখেই ছিল।

সেই সুখের সংসারে প্রথম ধাক্কাটা এল আকবরের মা মারা যাওয়ার পর। এই মৃত্যুটা হলো একদম হঠাৎ। মাত্র দু দিনের জ্বর। ডাক্তারের কাছে নেয়ার সুযোগও হয়নি। আসলে ডাক্তারের কাছে নেয়ার প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায়নি। মনে হয়েছিল, এ আর কী, সামান্য জ্বর, এমনিতেই সেরে যাবে। জ্বর সারল না, আকবরের মা মারা যান শেষরাতে, আকস্মিকভাবে। আকবর তার মার মৃত্যু দেখার সুযোগ পায়নি। কারণ ব্যাপারটা খুব দ্রুত ঘটেছিল এবং সে তখন ঘুমিয়ে ছিল। তাকে অবশ্য একটু পরই ডেকে তোলা হয়। সে উঠে দেখে বাড়িতে ভিড়, তার বাবা ঘরের একপাশে মাথা নিচু করে বসে আছেন। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না সে। একসময় সে জিজ্ঞেস করে, ‘কী হইছে ?’

একজন বলে, ‘জন্ম-মৃত্যু সব হইতেছে আল্লাহর হাতে।’

আকবর কিছুই বুঝতে পারে না। সে অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকায় আর বাবার দিকে এগোতে থাকে। চোখের জল মুছে তার ফুফু তাকে কোলে তুলে নেন। ‘আয়, তুই আমার লগে আয়।’

‘কই যামু ?’

‘আয়, বাইরে যাই।’

‘বাজানের কী হইছে ?’

‘কিছু হয় নাই।’

‘তয় চুপ কইরা বইসা আছে ক্যান ?’

‘এমনি।’

‘না, হইছে। কী হইছে, ফুফু, আমারে কও।’

‘তোর মায়ের হইছে রে বাপ, তোর মায়ের হইছে।’

‘মায়ের কী হইছে, কও আমারে।’

‘তার আগে আমারে ক, শুইনা তুই কানতে পারবি না।’

‘না, কানমু না।’

‘তোর মায়ে আসমানের তারা হইয়া গেছে রে বাজান, তারা হইয়া গেছে।’

‘ক্যামনে হইল !’

‘মানুষ মইরা গেলে আসমানের তারা হইয়া যায়, এইটা তুই জানস। জানস না ?’

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আকবর মাথা ঝাঁকায়। অর্থাৎ সে জানে।

মায়ের মৃত্যু আকবরকে নিঃসঙ্গ করে দেয় এমন নয়। কারণ তার বড় সঙ্গী তার বাবা। তবে ওই বয়সের শিশুর জন্য মায়ের মৃত্যু সব সময়ই মর্মান্তিক। আকবর স্কুলে যাওয়া বাদ দিয়ে প্রতিদিন তার মায়ের কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা প্রথমে অনেকেই খেয়াল করে না। তবে যেদিন রহিমউদ্দিনের কানে যায়, ক্ষেতের কাজ ফেলে তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। ‘বাজান, তুমি এইখানে কী কর ?’

আকবর ছোট করে বলে, ‘কিছু করি না বাজান, মায়ের পাশে বইসা থাকি।’

‘এইটা তুমি ক্যান কর বাজান ?’

‘মায়ে আমার ওপর রাগ করছে, তার রাগ ভাঙাই।’

‘তোমার মায়ে তোমার ওপর রাগ করছে ? এইটা তোমারে কে বলছে !’

‘মায়েই বলছে।’

‘না বাজান, এইটা ঠিক কথা না। মায়ে তোমার ওপর রাগ করে নাই।’

‘করছে। মায়ে যখন বাঁইচা ছিল, তহন তো তার লগে বেশি কথা কইতাম না, তোমার লগেই কইতাম...।’

রহিমউদ্দিনের দু চোখ জলে ভরে যায়। সে ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, ‘না রে বাজান, তোর মায়ে কখনো তোর ওপর রাগ করে না। তোরে ভালোবাসে।’

‘ভালোই যদি সে আমারে বাসে, তয় আমারে ছাইড়া চইলা গেল ক্যান ?’ আকবর জানতে চায়।

এই প্রশ্নের কোনো জবাব রহিমউদ্দিনের জানা ছিল না। তাই কোনো জবাব সে দিতেও পারে না।

আকবর অবশ্য নিজে নিজেই একসময় তার মায়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা থেকে সরে আসে। সরে আসে মানে মায়ের কবরে যাওয়া সে কমিয়ে দেয়। আগে যেমন সে প্রায়ই ওখানে দাঁড়িয়ে থাকত, সেই দাঁড়িয়ে থাকার পরিমাণটা কমে যায়, কমে যায় রোজ কবরে যাওয়া।

তবে সে যে আবার আগের মতো স্কুলে যেতে শুরু করে, তাও নয়। আসলে স্কুলে যেতে এবং পড়াশোনা করতে তার কখনোই ভালো লাগত না। সে একা একা ঘুরে বেড়ায়। নদীর ধারে গিয়ে কিংবা কোনো গাছে চড়ে চুপচাপ বসে থাকে।

রহিমউদ্দিনের খুব ইচ্ছে তার ছেলে লেখাপড়া শিখবে। তিনি আকবরকে বোঝাতে শুরু করেন। বারবার বোঝানোর ফলে আকবর আবার স্কুলে যেতে শুরু করে ঠিকই, কিন্তু বোঝা যায়, বিষয়টার প্রতি তার মন নেই। একবার স্কুলের এক মাস্টার রহিমউদ্দিনকে বলেন, ‘রহিমউদ্দিন, তোমার পোলায় তো লেখাপড়া কিছুই করে না।’

‘কিন্তু স্কুলে তো সে যায়।’

‘সেইটা যায়।’

‘তারপর?’

‘গিয়া চুপ কইরা বইসা থাকে। কিছু জিগাইলে উত্তর দেয় না।’

‘কিছু কি শিখছে? ল্যাখাপড়া?’

‘শিখব ক্যামনে? আমরা যহন শিখাই সে কি আমাগো কথা শোনে?’

রহিমউদ্দিন বলেন, ‘ও।’ তারপর তিনি ধরেন আকবরকে। ‘বাপ আমার, এইটা আমি তোমার নামে কী শুনতাছি?’

‘কী শুনতেছ?’

‘পড়াল্যাখায় তোমার নাকি কুনো মন নাই?’

আকবর জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে।

‘ল্যাখাপড়া না শিখলে বাজান তুমি কী করবা, কও?’

‘আমি তো ঠিকই করছি বাজান, বড় হইয়া আমি মুক্তিযোদ্ধা হমু।’

‘ক্যামনে হবা? যুদ্ধ তো শেষ।’

‘শেষ?’

‘হ, শেষ।’

‘তাইলে আমি মুক্তিযোদ্ধা হমু ক্যামনে?’

‘ল্যাখাপড়া শিখো বাজান।’

‘ল্যাখাপড়া শিখলে?’

‘অনেক কিছু জানবা, বুঝবা।’

‘তাইলে?’

‘ভালো চাকরি পাইবা।’

আকবর চুপ করে থাকে।

রহিমউদ্দিন বলেন, ‘বাজান, শুনো, ল্যাখাপড়া শিখন জরুরি। ল্যাখাপড়া না শিখলে কিছুই করন যায় না।’

‘কে কইছে? ল্যাখাপড়া না শিখা তুমি দেশটা স্বাধীন করলা না?’

‘আমি একা করি নাই রে বাপ। অনেকে মিলা করছে।’

‘ওই হইল। তুমিও তো ছিলা।’

‘ছিলাম।’

‘তাইলে? ল্যাখাপড়া না শিখাই তো তুমি দেশ স্বাধীন করছ।’

‘কিন্তু তারপর যে আর কিছু করতে পারলাম না।’

‘আর কী করবা ?’

‘দুইবেলা খাবার জোটাইতেই কী কষ্ট। অবস্থা তো বদলাইল না রে বাজান।’

‘ল্যাখাপড়া শিখলে কী হইত ?’

‘একটা চাকরি নিতে পারতাম। বাজান, তুই ল্যাখাপড়ায় মন দে। ল্যাখাপড়া না জানলে কুনো ইজ্জত নাই। দেখস না, সবাই শুধু ল্যাখাপড়া জানা মুক্তিযোদ্ধাগো কথা কয়। আমরা ল্যাখাপড়া জানি না বইলা আমাগো কথা কেউ কয় না।’

আকবর রহিমউদ্দিনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, ‘বাজান, তোমার মনে খুবই দুঃখ, না ?’

রহিমউদ্দিন আকবরকে জড়িয়ে ধরেন।

আকবরকে রহিমউদ্দিন মাঝে মাঝেই এভাবে জড়িয়ে ধরে রাখতেন। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি নিজেও অনেকটা একা হয়ে যান। তা ছাড়া আকবরকেও তিনি মায়ের অনুপস্থিতি বুঝতে দিতে চাইতেন না।

অথচ কী অদ্ভুত, এই রহিমউদ্দিনই একদিন আকবরের জীবন থেকে অনুপস্থিত হয়ে যান, সারা জীবনের জন্য। এ ঘটনাটা অবশ্য ঘটে ধীরে ধীরে। প্রথমে দেখা যায় রহিমউদ্দিনের পেটের এক কোণে একটা গোটার মতো হয়েছে। সেই গোটাটা একটু একটু করে উঁচু হতে থাকে। প্রথম দিকে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে চাননি রহিমউদ্দিন। কিন্তু তার বোন তাকে জোর করে পাঠান ডাক্তারের কাছে। স্থানীয়, অর্থাৎ গঞ্জের ডাক্তার ভালো মানুষ, তিনি নিজে চিকিৎসা না করে বলেন বড় ডাক্তারকে দেখাতে হবে। কিন্তু বড় ডাক্তারের কাছে যাওয়া তো মুখের কথা নয়। এর জন্য আর্থিক সঙ্গতি থাকতে হবে। কারণ শুধু গেলেই তো হবে না, বড় ডাক্তার তাকে যেসব পরীক্ষা করতে দেবেন, সেগুলোও করাতে হবে। তিনি তাই আগের মতোই জীবনযাপন করতে থাকেন। তবে কষ্ট হতো তার। তাকে দেখেই বোঝা যেত, হাঁটতে-চলতেও কষ্ট হচ্ছে তার, কাজ করতে তো বটেই। এবার ব্যবস্থা তার বোন করে। সে জন্য অবশ্য সময় লাগে কিছু। বেশ কিছুদিন পর বেশ কিছু টাকা কোত্থেকে কীভাবে যেন জোগাড় করে রহিমউদ্দিনের হাতে দিয়ে বড় ডাক্তারের কাছে যেতে বলেন। রহিমউদ্দিনের ইচ্ছে ছিল না। বলেন, ‘আরে এই অসুখ এমনি ভালো হইয়া যাইব। বুবু, তুমি টাকা পাইলা কই ?’– এসব বলে এড়িয়ে যেতে চান। কিন্তু রহিমউদ্দিনের বোন নাছোড়বান্দা, আর আকবরও আছে সঙ্গে। তারাই রহিমউদ্দিনকে নিয়ে যান ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বলেন, ‘আপনাদের নিয়ে সমস্যা কী জানেন, আপনারা অসুখকে কখনো গুরুত্ব দিতে চান না। সব সময় দেরি করে ফেলেন।’

উদ্বিগ্ন রহিমউদ্দিনের বোন ফাতেমা বলেন, ‘দেরি কইরা ভুল করছি, কিন্তু ডাক্তার সাব, আমার ভাইয়ের অবস্থা কী ?’

‘সুবিধার না, এটা আমি বুঝতে পারছি। তবে কনফার্ম, মানে নিশ্চিত হতে চাই। আপনারা এই টেস্টগুলো করান। তারপর আসেন।’

‘এইগুলা করাইতে খরচ কি খুব বেশি হইব ?’

‘অসুখ যখন বড়, তখন খরচ তো কিছু হবেই।’

‘কত হইতে পারে ?’

‘আহা, আমি কি মুখস্থ করে রেখেছি নাকি ? গিয়ে দেখেন। তবে তাড়াতাড়ি করলেই ভালো।’

ডাক্তারের রুম থেকে বেরিয়ে রহিমউদ্দিন বলেন, ‘এইবার বুবু টাকা পাইবা কোত্থেইকা ?’

ফাতেমার মুখ গম্ভীর ও থমথমে।

‘শুনো।’ রহিমউদ্দিন বলেন, ‘এইসব কইরা লাভ নাই।’

‘হ, তুই জানস লাভ নাই।’

‘আমার অসুখ আর আমি জানি না ! বুবু, আমার সময় শেষ।’

ফাতেমা রহিমউদ্দিনকে ধমকে ওঠেন। কিন্তু রহিমউদ্দিনের সত্যিই তখন সময় শেষ। বড় ডাক্তারের কথা অনুযায়ী কনফার্ম হওয়ার জন্য টেস্ট-ফেস্ট করতে হয়নি। তাদেরই পাশের গ্রামের এক ছেলে, মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, দেখে বলে, ‘আমার ধারণা এখন আর কিছুই করার নেই।’

রহিমউদ্দিনের পেটে টিউমার হয়েছিল, টিউমার থেকে ক্যানসার।

খুব কষ্ট পেয়ে মারা যান রহিমউদ্দিন। তার বোন শেষ চেষ্টা হিসেবে চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চিকিৎসার পয়সা কে দেবে ? গ্রামের সব লোকের তো দেয়ার সামর্থ্য নেই, যাদের আছে তাদের সবার কাছে ধরনা দেন ফাতেমা, সঙ্গে আকবরও, কিন্তু তারা কেউ কিছু করেন না।

আকবর খুব অবাক গলায় তার ফুফুকে জিজ্ঞেস করে, ‘ফুফু, আমি একটা ব্যাপার বুঝতেছি না।’

‘কী, বাজান ?’

‘আমার বাবায় তো যুদ্ধ করছে, যুদ্ধ কইরা দেশ স্বাধীন করছে। করছে না ?’

ফাতেমা বলে। ‘তুই কী বলবি, এইটা আমি জানি।’

‘জানো !’

‘জানি। তুই জিগাইবি– স্বাধীন দেশে তোর বাবা এইভাবে ক্যান মারা যাইতেছে।’

আকবর মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, আসলে সে এটাই জিজ্ঞেস করতে চায়, এটাই সে জানতে চায়– কেন !

না, এই ‘কেন’র উত্তর পায় না আকবর। রহিমউদ্দিনের শরীর ধীরে ধীরে আরো খারাপ হয়ে যায়। আকবরের তখন শুধু দুটো কাজ। এক, রহিমউদ্দিনের পাশে বসে থাকা, তার শরীরে হাত বুলিয়ে দেয়া আর কাঁদা। রহিমউদ্দিনের মনোবল তখনো অটুট। তিনি ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, ‘বাজান, কান্দস ক্যান !’

‘কান্দি।’

‘কান্দিস না। আমি একটা যুদ্ধ করতেছি। যুদ্ধের সময় কানতে নাই।’

‘যুদ্ধ তো তুমি আগেই করছ।’

‘করছি। সেইটা ছিল দেশের জন্য।’

‘আর এইটা ?’

‘এইটা ? বাজান, এইটা হইতেছে নিজের জন্য যুদ্ধ।’

‘একজন মানুষকে কতবার যুদ্ধ করতে হইব ?’

এই প্রশ্নে রহিমউদ্দিন নিশ্চুপ থাকেন, কিছুই বলেন না।

আকবর বলে, ‘এই যুদ্ধ তো তোমার করনের কথা না। তুমি দেশের জন্য যুদ্ধ করছ, দেশ স্বাধীন হইছে। আরে, এহন তো তোমার জন্য যুদ্ধ করব অন্য লোকে।’

রহিমউদ্দিন আকবরের কথা শোনেন, কিন্তু কিছু বলেন না। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন।

আকবরের দ্বিতীয় কাজ ছিল, প্রতিদিন গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে যাওয়া। বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে সে বলে, ‘আমার বাবা যে মুক্তিযোদ্ধা ছিল, এইটা তো জানেন ?’

উত্তর আসে একটাই, হ্যাঁ, তারা জানে।

‘মুক্তিযুদ্ধ কইরা সে আর অন্য অনেকে দেশ স্বাধীন করছে।’

আকবরের এ কথার উত্তর আসে নানা রকম।

কেউ বলে, ‘হ করছে, তো কী হইছে?’

কেউ বলে, ‘তুই আসল কথাটা ক।’

আবার কেউ বলে, ‘এখন কী করতে হইব?’

‘আপনারা তার জন্য কিছু একটা করেন।’ আকবর বলে, ‘সে আপনাগো জন্য করছিল, এইবার আপনারা তার জন্য করেন।’

এ কথারও উত্তর আসে এক রকম নয়, নানা রকম।

কেউ বলে, ‘আমার কাছে যে আসছস, আমার অবস্থা তুই জানস না?’

কেউ বলে, ‘তারে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি কর। সরকার তারে দেখব।’

আবার কেউবা বলে, ‘সে যে যুদ্ধে গেছিল, আমার লগে কথা কইয়া গেছিল যে তারে এহন আমার দেখতে হইব?’

এসব কথার কোনো উত্তর নেই। আকবর উত্তর দিতে পারে না। তখন কী-ইবা বয়স তার। তা ছাড়া উত্তর দেয়ার ইচ্ছেও তার ছিল না। সে শুধু অনুরোধ করে, বারেবারে অনুরোধ করে।

রহিমউদ্দিনের সময় ঘনিয়ে আসে।

রহিমউদ্দিন আকবরকে কাছে ডেকে বলেন, ‘বাপ আমার।’

‘কও বাজান।’

‘আমার আর সময় নাই।’

আকবর কেমন যেন তাকায়।

রহিমউদ্দিন বলেন, ‘স্বাধীনতার যুদ্ধে জিতছিলাম।’

‘জিতছিলা।’

‘কিন্তু জীবনযুদ্ধে আমি জিততে পারলাম না।’

‘ক্যামনে জিতবা!’ আকবর বলে, ‘কেউ তো তোমার লগে নাই।’

‘তোমারে একখান কথা কই বাপ আমার। শুনবা?’

‘শুনমু বাজান, শুনমু। তুমি কও।’

‘তোমারে কিন্তু হাইরা গেলে চলব না।’

আকবর তার বাবার দিকে পাথর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, কিছুই বলে না।

‘বাজান, তোমারে কিন্তু জিততে হইব।’

আকবরের কী হয় কে জানে, সে বলে, ‘আমিও তোমার মতন মুক্তিযোদ্ধা হমু।’

‘বাজান রে, এইসব কথা বাদ দাও। আমি না থাকি, তোমার ফুফু থাকল, সে তোমারে দেখভাল করব, তুমি নিয়মিত স্কুলে যাইবা।’

সবাই ভেবেছিল রহিমউদ্দিন মারা গেলে আকবর প্রচণ্ড কান্নাকাটি করবে। কিন্তু কোনো কান্নাকাটিই সে করেনি। সে দাঁড়িয়ে ছিল তার বাবার পাশেই। যখন বুঝতে পারল তার বাবা আর এই পৃথিবীতে নেই, সে শুধু অবাক চোখে তার ফুফু ফাতেমার দিকে তাকায়।

ফাতেমা কান্নাজড়িত গলায় বলেন, 'আকবর...।'

আকবর বলে, 'ফুফু, দেখছ... !'

'ফুফু দেখছ !' বলে সে চুপ করে থাকে।

ফাতেমা জিজ্ঞেস করেন, 'তুই কী দেখনের কথা কস বাজান, কী দেখনের কথা কস ?'

'এই যে।' বাবার শ্বাস-প্রশ্বাসহীন দেহের দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'এই যে, দেখলা না তুমি, বাবায় যে মইরা গেল !'

'দেখছি রে বাপ আমার।'

'দেখছ ? দেখছ– বাজান আমার মইরা গেল।'

ফাতেমা আকবরকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। কিন্তু আকবর একটুও কাঁদে না। আর একটা কথাও সে বলে না। দাফন পর্যন্ত সারাটা সময় সে চুপ করে থাকে। মায়ের কবরের পাশেই তার বাবার কবর হয়। আকবর শুধু বলে, 'এইটাই ভালো হইল। মায়ে এদ্দিন একা ছিল। এহন বাবা আছে তার কাছে। মায়ের আর একা একা লাগব না।'

তার ফুফু বলে, 'কিন্তু তুই যে একা হইয়া গেলি, এইটা তুই বুঝতাছস না?'

আকবর শুধু তার ফুফুর দিকে তাকায়, কিছু বলে না।

আকবরের ভেতর বড় পরিবর্তনটা দেখা যায় এই সময়ই। বাবা রহিমউদ্দিন মারা যাওয়ার পর সে চুপচাপ কদিন বাসায় বসে থাকে। তারপর একদিন যায় স্কুলে, যে স্কুলে যাওয়া সে বন্ধ করে দিয়েছিল। স্কুলের হেডমাস্টার তখন নাসেরুজ্জামান। আকবর বলে, 'স্যার, আপনি কি আমারে চিনেন ?'

'এই স্কুলে আমি কত দিন ধরে আছি, বল তো ?' নাসেরুজ্জামান মুচকি হাসেন। 'তোরে আমি চিনব না ?'

আকবর এ কথা শুনে হাসে। 'তাইলে এইবার আমার জন্য একখান কাজ করেন। পারবেন ?'

'কী কাজ ?'

'আমার বাবায় যে মারা গেছেন এইটা কি জানেন ?'

'আকবর, এইটা সবাই জানে। আমি তোর বাবার জানাজা আর দাফনের সময় ছিলাম।'

'ও, তাও ঠিক।'

'এখন কী করতে হবে, সেইটা বল।'

'বাবায় মারা গেছে, ট্যাকা-পয়সা নাই।'

'আহা, এইটাও তো আমরা জানি। টাকা-পয়সার অভাবে তোর বাবার চিকিৎসাও তো হলো না।'

'হ। কতজনের কাছে চাইলাম, কেউ কিছুই দিল না।'

এ কথায় নাসেরুজ্জামান একটু হলেও লজ্জা বোধ করেন। কারণ সে সময় তিনিও কিছুই করেননি। কোনো খারাপ কথা বলেননি ঠিক, তবে কিছু দেনওনি তিনি। সেই লজ্জা লুকোবার জন্য তিনি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে

থাকেন, তারপর বলেন, 'আকবর, তুই আসলে কী বলতে এসেছিস, সেটা বল।'

'বাবায় কইছিল, আমি যেন ল্যাখাপড়াটা করি।'

'করবি।'

'ট্যাকা-পয়সা নাই, বেতন দিমু কেমনে ?'

'তুই সত্যি লেখাপড়া করতে চাস ?'

'আহা, বাবায় বইলা গেছে না ?'

নাসেরুজ্জামান একটু ভেবে নিয়ে বলেন, 'ঠিক আছে, তুই কাল থেকে স্কুলে আসতে শুরু কর।'

'বেতন ?... বইখাতাও তো সব নাই।'

'ওসব নিয়ে তোর ভাবতে হবে না।'

'হ, কইলেন এক কথা ! আমার ব্যাপার আমি না ভাবলে কে ভাবব ?'

'বললাম তো, তোর ভাবতে হবে না।'

'ভাবলাম না।'

'তুই তোর কী কী বইখাতা দরকার, তার একটা লিস্ট আমাকে দিবি। আর আগামীকাল, না, আগামীকাল থেকে না, আগামী পরশু থেকে তুই স্কুলে আসতে আরম্ভ কর।'

'জি, করব।' আকবর হাসিমুখে বলে।

নাসেরুজ্জামান যা করেন, তা তিনি আকবরকে জানান না। রহিমউদ্দিনের চিকিৎসার সময় তিনি কিছুই করেননি, এ নিয়ে তার যথেষ্ট লজ্জা ছিল। এখন তার ছেলেটা আবার নতুন করে লেখাপড়া শুরু করতে চাইছে, নাসেরুজ্জামানের মনে হয় এ ক্ষেত্রে তিনি যদি কিছু করতে পারেন, তবে তার লজ্জাও যেমন কাটবে, একটা কাজও হবে। স্কুলের হেডমাস্টার হিসেবে তার বেশ কিছু ক্ষমতা আছে। নাসেরুজ্জামান স্কুলের সেক্রেটারি এবং তার সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। অধিকাংশ শিক্ষকই আকবরকে বিনা বেতনে পড়াতে রাজি হন। দু-একজন অবশ্য ক্ষীণ আপত্তি করেন। তারা বলেন, 'ওর মাথায় কিছু নাই। ও কি লেখাপড়া শিখতে পারবে ? তা ছাড়া ও ক্লাসে সবাইকে খুবই বিরক্ত করে।'

এসব আপত্তি অবশ্য টেকে না। ঠিক হয়, আকবর আবার স্কুলে আসতে আরম্ভ করবে। তার অবশ্য বইখাতা কিছুই নেই, এসব দরকার। নাসেরুজ্জামান বলেন, এসবের ব্যবস্থা তিনিই করবেন। অন্য শিক্ষকদের কেউ কেউ কিছু সাহায্য করতে চান। সেক্রেটারি সাহেবও মোটামুটি সাহায্য করেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা যায়, আকবরের আবার নতুন করে লেখাপড়া শুরু করার একটা ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

আকবর আবার ক্লাস করতে শুরু করে। বইখাতা নিয়ে নতুন জামা পরে হাসিমুখে সে স্কুলে এসে হাজির হয়। ক্লাস শুরুর আগেই তাকে ডেকে পাঠান নাসেরুজ্জামান। জিজ্ঞেস করেন, 'বলো তো আকবর, তোমার কেমন লাগছে ?'

আকবর হাসিমুখে বলে, 'স্যার, এইটা আমি কইতে পারমু না।'

'ক্যান, কী হইল ? বলতে পারবা না ক্যান ?'

'আমার স্যার এতই আনন্দ লাগতাছে...'

'সেই জন্য বলতে পারবা না ?'

আকবর হাসিমুখে মাথা ঝাঁকায়।

'লেখাপড়া কিন্তু মন দিয়ে করবে।'

'হ স্যার, এইবার ল্যাখাপড়ায় খুবই মন দিমু।'

'তোমার বাবা কিন্তু তোমারে লেখাপড়া করতে বলে গেছেন...।'

'সেইটা কি আপনারে বলছে ? বলছে আমারে। আমার মনে আছে।'

'কিছু কিছু শিক্ষক কিন্তু তোমারে আবার ভর্তি করতে চাইছিল না।'

'ক্যান স্যার ? আমি কী দোষ করছি ?'

'তুমি মন দিয়ে লেখাপড়া কর না।'

'কইলাম না স্যার, এইবার খুবই মন দিমু।'

'তুমি নাকি খুবই দুষ্টুমি কর।'

'দুষ্টামি করি আমি ! না স্যার, এইটা ঠিক কথা না।'

আকবরের ভাবভঙ্গি দেখে হাসেন নাসেরুজ্জামান। 'দুষ্টুমি কর না ?'

আকবর গম্ভীর মুখে বলে, 'না স্যার, করি না। বাবায় আমারে দুষ্টামি করতে নিষেধ কইরা গেছে।'

'খুব ভালো কথা। তবে দেখুম আমি।'

'জি স্যার, দেখবেন।'

'আর শুধু দুষ্টুমি না করলেই হবে না, পড়াশোনায়ও তোমারে ভালো হতে হবে।'

আকবর আরো গম্ভীর মুখে বলে, 'সেই জন্যই তো আবার স্কুলে আসা।'

আকবর সত্যিই মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করে। কিন্তু সত্য কথা হলো সে পড়াশোনা করে ঠিকই, তবে কেন যেন কিছুই মনে রাখতে পারে না। ক্লাসে যা শেখে, স্কুল ছুটির পর সেসবের কিছুই আর মনে থাকে না। রাতে ফুফুর কাছে যা পড়ে, রাত ফুরোবার আগেই তা ভুলে যায়। লেখাপড়া এত কঠিন ব্যাপার, এটা নতুন করে বুঝতে পেরে সে যেন একটু চিন্তিতই হয়ে পড়ে। কী করবে, কী করলে লেখাপড়া ব্যাপারটা সহজ মনে হবে, এটা বুঝে ওঠার আগেই আকবরকে ডেকে পাঠান নাসেরুজ্জামান।

তিনি বলেন, 'আকবর, তোমার দেখি কোনো উন্নতি নাই।'

আকবর বলে, 'জি স্যার, এর মইদ্যে আরো দুই-তিন ইঞ্চি লম্বা হইছি, এ ছাড়া আর তো কোনো উন্নতি দেখতাছি না। কী যে করি !'

'তোমার কি লেখাপড়া করতে ইচ্ছে করে না ?'

'খুবই ইচ্ছা করে স্যার। বাবারও শেষ ইচ্ছা।'

'তাহলে অসুবিধা কোথায় ? মন বসাইতে পার না ?'

'মন না স্যার, মাথা। সমস্যা মাথায়। মাথার মইদ্যে কিছুই ঢুকতে চায় না।'

'মাথায় কিছু না ঢুকলে লেখাপড়া করবা কী করে ?'

'এইটাও স্যার আমি ভাবছি। কিন্তু এইটাও আমার মাথায় ঢুকে নাই।'

হেডমাস্টার নাসেরুজ্জামান ক্লান্ত গলায় বলেন, 'দেখো।'

দেখাদেখির আসলে কিছু ছিল না, কয়েক দিন পর আকবর লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। এই কঠিন সিদ্ধান্তটা সে অবশ্য নিজেই নেয়। সে দেখে এই যে স্কুলে যাচ্ছে আর আসছে, এতে সময়ই নষ্ট হচ্ছে শুধু, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আর মাঝখানে বেশ কিছুদিন লেখাপড়া করেনি বলে, তাকে ক্লাস করতে হচ্ছে তার চেয়ে বয়সে ছোট ছেলেদের সঙ্গে। কিছু না পারলে ওরা খুব হাসাহাসি করে, তখন তার খুব লজ্জা লাগে। তবে এটাই বড় কারণ নয়। বড় কারণ হচ্ছে নিজের অক্ষমতা। সে নাসেরুজ্জামানকে গিয়ে বলে, 'স্যার, বহু ভাবনা-চিন্তার পর দেখলাম ল্যাখাপড়া আমার কাম না।'

নাসেরুজ্জামান আকবরের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

'যেইটা স্যার আমার কাম না, সেইটা স্যার করা উচিত না।'

'কী করবা তুমি ?'

'ল্যাখাপড়া স্যার বাদ।'

'বুঝলাম। তারপর ?'

'সেইটা স্যার এখনো ঠিক করি নাই।'

'তোমার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারতেছি। কী আর বলব !'

'কিছু কওয়ার দরকার নাই স্যার, শুধু দোয়া কইরেন।'

'দোয়া আমি সব সময়ই করি, করবও।... আকবর।'

'জি স্যার?'

'জীবনে সফল হতে হলে শুধু যে লেখাপড়া জানতে হয়, তা নয়। লেখাপড়া ছাড়াও কেউ কেউ জীবনে সফল হতে পারে।'

'জি স্যার।'

'দোয়া করি, তুমি যা হতে চাও, তা যেন হতে পার।'

'দোয়া কইরেন স্যার, আমি যেন মুক্তিযোদ্ধা হইবার পারি।'

'মুক্তিযোদ্ধা হবা ?'

'জি স্যার। মুক্তিযোদ্ধা হইতে হইলে ল্যাখাপড়া লাগে না। দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকলেই চলে।'

স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় আকবর। তাই বলে বাসায়ও বসে থাকে না সে। তাকে দেখা যায় পুরো গ্রাম ঘুরে বেড়াতে। অবশ্য খামোখাই ঘুরে বেড়ায় না। পরিচিতজন কাউকে পেলে জানতে চায় তার কোনো কাজ করে দিতে হবে কি না।

কখনো হয়তো গ্রামের মুদিদোকানে গিয়ে বসে। মুদিদোকানে সব সময় কিছু না কিছু ভিড় লেগেই থাকে, কেবল দুপুরের দিকে ক্রেতার সংখ্যা হয়তো কিছু কম হয়। কিন্তু আকবর যায় সকালের দিকে। একদম ভোরবেলা সে ওঠে। একা একা ঘোরে। কখনো নদীর পাড়ে গিয়ে বসে থাকে। তারপর বাসায় ফিরে নাশতা করে আবার বের হয়। নির্দিষ্ট করে কোথাও যাওয়ার নেই, তাই সে হয়তো মুদিদোকানে এসে বসে। দোকানির নাম বাবুল। বাবুল একেবারেই দেখতে পারে না আকবরকে। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'তুই দোকানে আইসা বইলে আমার বেচা-বিক্রি কইমা যায়।'

এসব নিয়ে কখনোই মাথা ঘামায় না আকবর। সে এসে বসে দোকানের একপাশে বসানো বেঞ্চে। বেঞ্চে জায়গা না থাকলে সে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবুল তার দিকে ফিরেও তাকায় না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একসময়

আকবর বলে, 'চাচা।'

বাবুল কথা বলে না।

'ও চাচা।'

বাবুল তার ক্রেতাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

'ও চাচা, শুনেন না ?'

এবার হয়তো বাবুল রাগ রাগ গলায় বলে, 'শুনুম না ক্যান। কী কস তুই?'

'খুব ব্যস্ত ?'

'তুই দেখতাছস না, ব্যস্ত কি ব্যস্ত না !'

'ব্যস্তই তো দেখতাছি।'

'তাইলে আর জিগাস ক্যান। চুপ কইরা থাক। অন্য জাগাত যা।'

'কেমনে যাই, আপনে তো একা একা সামলাইতে পারতেছেন না।'

'সেইটা আমি বুঝমু, তুই যা।'

'চাচা, আপনে চাইলে আপনের লগে হাত লাগাইতে পারি।'

এ রকম কথোপকথন বাবুল আর আকবরের মধ্যে প্রায় রোজই হয়।

বাবুল আবার চেঁচিয়ে ওঠে, 'খবরদার।'

'আহা, আমি হাত লাগাইলে আপনারই তো সুবিধা।'

'না।'

'একা একা তো পারতেছেন না।'

'তবু তরে দরকার নাই।'

'কী আশ্চর্য কথা !'

'তুই এই দোকানের ভেতরে ঢুকলে কী হইব জানস ?'

'কী হইব ?'

'কুফা লাগব।'

'কুফা লাগব !'

'তুই দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া থাকলেই কুফা লাগে, আর তুই ভেতরে আইলে আমার বিক্রি-বাট্টা চিরজনমের জন্য বন্ধ হইয়া যাইব।'

এ রকম কথা হয় প্রায় রোজই, আকবর তবু বাবুলের দোকানের সামনেই অনেকটা সময় পার করে দেয়। তবে এক জায়গায় কতক্ষণই বা বসে থাকা যায় ! তাই আকবর পুরো গ্রাম ঘুরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর নেয়, কারো কোনো দরকার আছে কি না।

অধিকাংশ বাড়িতে সে পায় বিরূপ অভ্যর্থনা। বাড়িতে যে থাকে, সে হয়তো বলে, 'আমার কাজ তোরে দিয়া করাইয়া নিতে হইব ?'

‘আহা, করায়ে নিলে অসুবিধা কী !’

‘কী কাজ তোরে দিয়া করামু ?’

‘ধরেন, পুকুর থেইকা পানি আনতে হইব, আইনা দেই।’

‘পুকুরে যাওন লাগব ক্যান ! টিউবল তো আছেই।’

‘তাইলে দেন টিউবলই চাইপা দেই।’

‘তুই যা।’

‘যামু !’

‘হ, তুই যা।’

কিছু কিছু বাড়িতে অবশ্য আকবরের সামান্য খাতির জোটে। তবে সেটা যত না আকবরকে ভালোবাসার কারণে, তার চেয়ে অনেক বেশি তার কাছ থেকে কিছু কাজ আদায় করে নেয়ার আনন্দে। তবে সেসব লোকও তাকে দেখে এমন আচরণ করে, এমন ভাব দেখায়, যেন তাদের তাকে কোনোই দরকার নেই, শুধু আকবরের জেদাজেদিতেই তারা কাজ দিচ্ছে।

কেউ আকবরকে দিয়ে টিউবওয়েল চাপিয়ে পানি তুলে নেয়, কেউ আঙিনা সাফ করায়, কেউ গাছ থেকে ডাব বা নারকেল পাড়ায়।

কাজ শেষে আকবর বলে, ‘যাই তা হইলে।’

‘যাবি ? ঠিক আছে যা।’

একটু ইতস্তত করে আকবর আবার বলে, ‘ঘরে কি কিছু আছে ?’

‘ঘরে আবার কী থাকব ?’

‘না, এই ধরেন– মুড়ি, মোয়া। খাইতে খাইতে হাঁটতাম।’

‘নাই রে, ঘরে কিছু নাই।’

‘অ। ডাব যে পাড়লাম ?’

‘তো ?’

‘অনেকগুলা তো পাড়লাম। আমার বেশি দরকার নাই, একটা দিলেই সই।’

‘আকবর, তুই কি ডাবের লোভে ডাব পাড়লি, না আমার উপকার করবি বইলা পাড়লি ?’

‘আরে, লোভ আবার কী ! আপনার উপকার হইব তাই পাড়লাম।’

‘তাইলে এখন যা, ডাব আরেক দিন নিস।’

আরেক দিন যে ডাব সত্যি কপালে জুটবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বরং আকবর এটুকু নিশ্চয়ই বুঝত যে তাকে ডাব বা অন্য কিছু দেয়ার ইচ্ছেই কারো নেই। তাতে অধিকাংশ সময়ই তার মন খারাপ হয় না। কখনো কখনো একটু হয়, তবে সেটা সাময়িক। সেটা সে নিজের ভেতরই লুকিয়ে রাখে। এবং কয়েক দিন পর আবার হয়তো কোনো বাসায় গিয়ে খোঁজ নেয়, তাদের কোনো কাজ করে দিতে হবে কি না। অন্যের উপকার করার মধ্যেই যেন তার আনন্দ।

অবশ্য এমনও কেউ কেউ আছে, তার আনন্দের অংশীদার হয়। এমন তো নয় যে গ্রামের সবাই খারাপ। বিলকিস খালার বাসায় আকবরের সমাদর খুবই। বিলকিস খালার বাসায় গিয়ে কাজ করুক আর না-ই করুক,

তেল আর পেঁয়াজ দিয়ে মুড়ি মাখানো তার যেন যখন-তখন তৈরি থাকে। আবার কখনো সে মোয়া-মুড়কি পায়, কখনো বাতাসা। তবে ওই বিলকিস খালার বাসায়ই সে কম যায়। কেন সে কম যায়, বিলকিস খালা মাঝে মাঝেই জানতে চান। আকবর একটা কথাই বলে, 'শরম লাগে।'

বিলকিস খালা অবাক হন। 'শরম লাগে মানে !'

'লাগে।'

'ক্যান !'

'এইটা আমি আপনারে বুঝাইয়া কইতে পারমু না।'

'বুঝলাম। কিন্তু শরম লাগনের একটা কারণ তো থাকতে হইব।'

'আমার মনে হয়...' পর্যন্ত বলে আকবর চুপ করে থাকে।

'কী মনে হয় ?'

'এইটাও কইতে শরম করতেছে।'

'ক কইলাম।'

'আমার মনে হয় আমারে দেইখা আপনে ভাবেন আমি বুঝি খাইতে আসি।'

যেদিন এ কথা প্রথম বলেছিল আকবর, সেদিন আকবরের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন বিলকিস খালা। তা দেখে আকবর খুব অস্বস্তিতে ভুগতে আরম্ভ করেছিল। 'কী হইল ?'

'তুই কী কইলি ?'

'শুনছেন তো।'

'আবার ক।'

'এক কথা আবার কওনের কী দরকার ?'

'ক কইতেছি।'

আকবর আবারও বলেছিল, আর এর পরপরই তার গালে একটা চড় বসিয়েছিলেন বিলকিস খালা আর চড় বসিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। চড় খেয়ে অবাক হয়নি আকবর, সে অবাক হয়েছিল বিলকিস খালার কান্না দেখে। কী করবে সে বুঝতে পারছিল না। দু চোখ মুছে নিয়ে বিলকিস খালা একসময় জানতে চাইলেন, 'এই রকম বাজে কথা আর কইবি ?'

'কথা তো সত্য।'

'এত দিন আমার বাসায় আইসা আকবর তুই এই বুঝলি !'

শুনে আকবর খুবই লজ্জা পায়। কী করবে, কী বলবে বুঝতে না পেরে সে কেবল মাথা চুলকায়। বিলকিস খালা আবারও জিজ্ঞেস করেন, 'এই রকম বাজে কথা আর কোনো দিন কইবি ?'

আকবর দুপাশে মাথা নাড়ে।

'মনে থাকে য্যান্।'

'থাকব।'

'এখন ভাইবা-চিন্তা একটা কথা ক।'

বিলকিস খালা কী বলে তা শোনার জন্য আকবর তার দিকে তাকায়।

'আমার কাছে আহস ক্যান, এইটা সত্য কইরা ক।'

'কী কমু ?'

'যা জানতে চাইলাম তা-ই কইবি।'

আকবর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

'ক।'

মুখ নিচু করে আকবর বলে, 'এইখানে আইলে ভালোবাসা পাই।'

'সত্য ?'

'সত্য।'

'মন থেইকা কইতেছস ?'

'হ, মন থেইকা কইতেছি।'

'ঠিক আছে, বিশ্বাস গেলাম।'

বিলকিস খালার ওখানে রোজ যায় না আকবর। অনেক কিছুই সে বোঝে না, তবে এটুকু বোঝে, ভালোবাসার জায়গায় বেশি যেতে হয় না। ভালোবাসার জায়গায় বেশি গেলে ভালোবাসার স্বাদ আর আগের মতো থাকে না। তবে ভালোবাসার এ রকম দু-তিনটা জায়গা আছে বলেই জীবন বড় সুন্দর। আকবর বোঝে ভালোবাসার এ রকম জায়গা না থাকলে মনের অনেক কথাই সে কখনো খুলে বলতে পারত না।

মনের অনেক কথা সে বিলকিস খালাকে খুলে বলতে পারে। খুলে বলতে পারে সে নাসেরুজ্জামান হেডমাস্টারকেও। কথা অবশ্য ফুফুকেও বলা যায়, বলেও সে। তবে ফুফু ব্যস্ত থাকেন খুব। সংসার চালাবার জন্য নানা রকম কাজ করেন ফুফু। তবে সে সবই মেয়েদের কাজ। সুতরাং ফুফুকে প্রায় কোনো কাজেই সে সাহায্য করতে পারে না। আর যা-ই হোক, সেলাই তাকে দিয়ে হবে না। সে চেষ্টাও অবশ্য সে করে দেখেছিল। কিন্তু সুই বারবার এদিক-ওদিক চলে যায়। ফুফুকে অবশ্য অন্যান্য কাজে সে অনেক অনেক সাহায্য করে। ফুফু চান না সে করুক, তবু সে করে। ফুফু চান লেখাপড়া যখন হলোই না তাকে দিয়ে, তখন সে কিছু একটা কাজ শিখুক। কারণ কিছু একটা করে তো তাকে জীবন পার করতে হবে।

এই নিয়ে আকবরের নিজের কোনো মাথাব্যথা নেই। সে বলে, 'ক্যান, চলতেছে তো।'

ফুফু হাসেন। 'এখন চলতেছে, কিন্তু আমি যখন থাকমু না, তখন কী হইব?'

'আরে, তুমি আবার যাইবা কই !'

'আহা, আমি কি চিরদিন বাঁইচা থাকমু? তোর বাবা-মার কাছে যামু।'

'বাজান আর মায়ে গেছে গিয়া, তুমিও যাবা গিয়া ?'

'বাবা রে, এইটাও আল্লাহর বিধান।'

'অ।... শুনো, তোমার যাওনের দেরি আছে।'

আকবরের আরেকটা ভালোবাসার জায়গা হেডমাস্টার নাসেরুজ্জামান। মনের ভেতর কথা বেশি জমলে সে সোজা চলে যায় নাসেরুজ্জামানের কাছে।

মনের ভেতর কথা অবশ্য প্রায়ই জমে থাকে। জমার কারণও আছে। তার ধারণা তাকে কেউই সহযোগিতা করে না। যেমন, বিকেলে সে যায় খেলার মাঠে। নদীর পাড়ে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। বিকেলে গ্রামের

ছেলেরা ওখানে জড়ো হয়, ওটাই খেলার মাঠ। ছেলেরা দল বেঁধে ওখানে ফুটবল খেলে, কখনো কখনো ক্রিকেটও। আকবরের খুবই ইচ্ছে ওসব খেলায় অংশ নেয়ার। কিন্তু কোনো দলই তাকে নিতে চায় না। সে নাকি কিছুই খেলতে পারে না। আকবরের নিজের ধারণা অবশ্য অন্যরকম। তার ধারণা, সব খেলাই সে খুব ভালো খেলে। আল্লাহ তাকে পড়াশোনার মাথা না দিক, খেলাধুলার যোগ্যতা ঠিকই দিয়েছেন।

অথচ দলে ঢোকার জন্য প্রতিদিন তাকে ঝগড়া করতে হয়। 'কী, দলে নিবি না আমারে ?'

যাকে জিজ্ঞেস করা হয়, সে হয়তো কোনো দলের ক্যাপ্টেন, সে বলে, 'না, নিমু না।'

'ক্যান নিবি না ?'

'আমার ইচ্ছা।'

আকবর তখন অন্য দলের ক্যাপ্টেনের কাছে যায়। তাকে বলে, 'তোর দলে আমারে নিবি ?'

'না।'

'অ। তুইও নিবি না ! তা, ক্যান নিবি না ?'

'তোরে নিয়া কী করমু ? তুই খেলতে পারস ?'

'আমি খেলতে পারি না !'

'না।'

'আর তোরা একেকজন বড় বড় খেলোয়াড় হইছস ?'

'হইছিই তো।'

'ম্যারাডোনা হইছস ?'

'তোর লগে অত কথা কওনের সময় নাই। তুই বইসা থাক।'

'ঠিক আছে, আমি মাঠের মাঝখানে বসলাম। মাঠের মাঝখানে বইসা দেখি, তোরা কেমন খেলস।'

মাঠের মাঝখানে কেউ বসলে আর খেলা হয় না। স্বভাবতই এ নিয়ে অন্য ছেলেদের সঙ্গে আকবরের ঝগড়া লেগে যায়। আকবরের এক কথা– তাকে খেলায় নিতে হবে, নইলে সে মাঠের মাঝখানে বসে থাকবে। অন্য ছেলেরা বলে তাকে কোনোভাবেই নেয়া যাবে না, কারণ সে কিছুই খেলতে পারে না, খেলতে নেমে খেলা নষ্ট করে ফেলে। এ নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি থেকে শুরু করে কোনো কোনো দিন মারপিটও বেধে যায়। আকবরকেই কম-বেশি মার খেতে হয়। কারণ ও একা, ওরা অনেক।

শেষে আকবর গিয়ে নাসেরুজ্জামানের কাছে নালিশ করে। 'স্যার, আপনে এইটার বিচার করেন।'

কিসের বিচার করতে হবে, নাসেরুজ্জামান জানতে চাইলে আকবর সব খুলে বলে, 'স্যার, আপনি ওগোরে ডাইকা আনেন, আইনা খুব কইরা ধমকাইয়া দেন, উহু রে, আমার মতো খেলোয়াড়কে বসায়া রাখে !' নাসেরুজ্জামান তা-ই করেন, তা-ই করেন মানে তিনি কায়েকজনকে ডেকে পাঠান, তাদের সঙ্গে কথা বলেন, তারপর আকবরকেও ডেকে পাঠান। আকবরের মুখে হাসি। 'স্যার, ঠিকমতো ধমকাইয়া দিছেন তো ?'

নাসেরুজ্জামান বলেন, 'আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি।'

'আইজ মাঠে যামু। এই কয়দিন যাই নাই।'

'আকবর, তুমি নাকি খেলা নষ্ট কর ?'

শুনে আকবর অবাক মুখে নাসেরুজ্জামানের দিকে তাকায়। 'আপনারে ওরা এই কথা কইয়া গেল !'

নাসেরুজ্জামান মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, 'শুনলাম।'

'মিথ্যুক স্যার, মিথ্যা কইছে।'

'তুমি নাকি একবার ব্যাট দিয়া বাড়ি দিয়া উইকেট ভেঙে ফেলছিলা ?'

আকবর থতমত খেয়ে চুপ করে থাকে।

'এই কথা কি সত্য, বলো ?'

'পুরা সত্য না স্যার। কিছু সত্য।... ঘটনাটা কই ?'

'বলো।'

'ব্যাট করতে নামছি স্যার, দলের অবস্থা খারাপ। ভাবলাম দুই-চারটা চার-ছয় মারতে হয়।'

'হুঁ। তারপর ?'

'বল করতেছিল সোবহান। ওই শয়তানে এত জোরে বল করল, কিছুই দেখলাম না স্যার, বল আইসা সোজা উইকেটে লাগল।'

'আর তুমি ব্যাট দিয়া বাড়ি দিয়া উইকেট ভেঙে দিলা ?'

'মাথা ঠিক থাকে, কন ? দলের অবস্থা খারাপ, এই অবস্থায় প্রথম বলেই আউট।'

নাসেরুজ্জামান গম্ভীর গলায় বলেন, 'তাই বলে তুমি উইকেট ভেঙে দিবা !'

'ভাঙা উচিত ছিল সোবহানের মাথা। ভাবছিলামও একবার– মাথা বরাবর এমন একখান বাড়ি দিমু ! কিন্তু সাহস হইল না।'

'এইসব তুমি কী কথা বলতেছ আকবর ?'

'স্যার, আপনে শুধু আমার দোষ দেখতাছেন, সোবহানের দোষ দেখবেন না ? খেলতে নামছি, আমারে খেলতে দিব না। দলের ওই অবস্থায় আউট কইরা দিব। এইটা কি ও ভালো করছে, কন স্যার ?'

নাসেরুজ্জামান গম্ভীর থাকতে পারেন না। তিনি হাসি লুকান। তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি নাকি একবার ফুটবল খেলায়ও কী গোলমাল করছিলা ?'

'আমি !' খুব গম্ভীর মুখে আকবর জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, তুমি।'

'আশ্চর্য ব্যাপার, এত বড় একটা মিথ্যা কথা আপনেরে কে কইল ?'

'যে-ই বলুক, তুমি কিছু করছ কি না সেইটা বলো।'

'কী করছি ?'

'তুমি নাকি নিজেদের গোলপোস্টেই গোল দিছিলা ?'

'অ, এই কথা !'

'দিছিলা ?'

'এই ঘটনা কে কইছে ?'

'তুমি ওই কাজটা করছিলা কি না সেইটা বলো।'

আকবর চুপ করে থাকে।

'কী হলো ? তুমি দেখছি বোবা হয়ে গেলা !'

আকবর বলে, 'স্যার, এইটার একটা ব্যাপার আছে।'

'নিজেদের জালে গোল দেয়ার ?'

'জি স্যার।'

'ব্যাপারটা কি বলা যাবে ?'

'জি স্যার, অবশ্যই বলা যাইব।'

'বলো তো দেখি।'

'তার আগে স্যার আপনে কন– ফুটবল কিসের খেলা ?'

'ফুটবল কিসের খেলা মানে ? ফুটবল বলের খেলা।'

আকবর হাসতে আরম্ভ করে। 'হইল না স্যার, হইল না।'

'হলো না কেন ?'

'স্যার, ফুটবল হইতেছে গোলের খেলা।'

'আচ্ছা !'

'গোলই যদি না হইল তাইলে আর ফুটবল খেইলা কী লাভ ?'

'বেশ। তা, এখন তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, সেইটার পিছনে কী কারণ, তা বলো।'

'এইটা স্যার সহজ ব্যাপার। সেইদিন স্যার খেলা হইতেছিল দারুণ। দুই দলের সমানে সমানে লড়াই। কেউ কাউরে গোল দিতে পারে না। এইভাবে খেলার সময় প্রায় শেষ হইয়া আসল।'

'তারপর ?'

'আমি দেখলাম খেলা প্রায় শেষ, কিন্তু গোল কেউ দিতে পারল না। স্যার, আগেই কইছি ফুটবল হইতেছে গোলের খেলা। আমি ভাবলাম, গোল একটা দেওয়া দরকার, না হইলে এই খেলার কুনো মানে হয় না। তখন আমি জান দিয়া খেলতে আরম্ভ করলাম।'

'নিজের জালে বল ঢুকালা কেন ?'

'এইটা স্যার আপনেরে বুঝাইতে হইব। জান দিয়া খেলতে আরম্ভ করলাম ঠিকই, কিন্তু গোল কি আর হয় ! যতবারই বল নিয়া ওদের গোলপোস্টের দিকে যাই, ওরা লেংডি মাইরা ফালায়া দেয়। কয়েকবার লেংডি খাওনের পর বুঝলাম অগোরে গোল দেওন যাইব না। আবার সময়ও নাই হাতে। শেষে আল্লাহর নাম নিয়া নিজেগো পোস্টেই একটা গোল দিয়া দিলাম। স্যার, ফুটবল হইতেছে গোলের খেলা, যে পক্ষেই হোক, গোল তো হইল!'

নাসেরুজ্জামানকে আবার হাসি চাপতে হয়, তিনি বলেন, 'তুমি কেন মনে কর এরপরও ওরা তোমারে খেলায় নিব ?'

আকবর গম্ভীর গলায় বলে, 'ঠিকমতো বিবেচনা করলে ওদের স্যার আমারে খেলায় নেওয়া উচিত। আমি উচিত কাজটাই করি।'

নাসেরুজ্জামানের চেষ্টার পরও আকবর ঠিকমতো খেলায় সুযোগ পেল না। যে খেলতে নেমে অমন কাণ্ড ঘটায়,

তাকে নিয়মিত খেলায় নিতে নাসেরুজ্জামান বলেনই বা কীভাবে? তিনি শুধু ছেলেদের আকবরকে মাঝে মাঝে খেলায় নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ছেলেরাও তার অনুরোধ কিছুটা শোনে, পুরোটা শোনে না। তারা কখনো-সখনো ৫/১০ মিনিটের জন্য আকবরকে খেলায় নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ওই অল্প সময়ের জন্য খেলতে নেমে আকবরের মন ভরে না। সে শেষে একদিন ছেলেদের বলে, 'তোমাগো লগে আমার খেলা মিলতেছে না।'

একজন বলে, 'বুঝছস তাইলে ?'

'বুঝছি।'

আরেকজন বলে, 'পাগলে যে বুঝছে, এইটা বড়ই খুশির খবর।'

'তুই আমারে পাগল কইলি রকিব ?'

'হ, কইলাম। পাগলরে পাগল কইলাম। অসুবিধা কী ?'

একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে আকবর বলে, 'নাহ্, কুনো অসুবিধা নাই।'

'তোর দেখি বুদ্ধি খুলছে।'

'তোরা এক কাম কর। খেলতে যখন লইবিই না, তখন আমারে রেফারি বানা।'

'তুই রেফারি হবি ?'

'হইলাম।'

'তুই রেফারিগিরি করন জানস ?'

'না জাননের কী হইল, পরথম চান্সেই সোবহান আর রকিবরে লাল কার্ড দেখামু।'

আকবরের রেফারি হওয়া হয় না। তাই বলে সে বিকেলে মাঠে আসা বাদ দেয় না। দর্শক সে। হাততালি দিয়ে দু দলকেই উৎসাহিত করে। মাঝে মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহে মাঠের ভেতরেই ঢুকে যায়। এ নিয়ে কেউ অবশ্য কিছু মনে করে না। এটুকু পাগলামো তাকে করতে দেয়াই যায়।

এ সময়ই বুঝি তার নামের সঙ্গে 'পাগল' শব্দটা স্থায়ীভাবে লেগে যায়। অনেকেই তাকে 'পাগল আকবর' বলে ডাকতে আরম্ভ করে, অনেকে ডাকতে আরম্ভ করে শুধু 'পাগল' বলে।

ফুফু তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেন, 'বাজান, এইসব কী শুনতাছি ?'

'কী শুনতেছ ?' আকবর ফুফুর কাছে পাল্টা জানতে চায়।

'তোরে নাকি সবাই পাগল কইয়া ডাকে ?'

'সবাই না। তুমি কি পাগল কইয়া ডাকো ?'

'লোকে ডাকে ?'

আকবর হাসিমুখে বলে, 'ডাকে।'

'তুই কিছু কস না ?'

'কী কমু ?'

'তোরে পাগল কইয়া ডাকব, আর তুই কিছু কবি না ?'

'কওনের কী দরকার ! আমার তো অসুবিধা হইতেছে না।'

‘আশ্চর্য কথা !’

‘ফুফু, শুনতে কিন্তু মন্দ লাগে না।’

‘পাগল ডাক শুনতে মন্দ লাগে না !’

আকবর মুখে হাসি নিয়ে না-সূচক মাথা নাড়ে।

‘তাইলে ঠিক আছে, তোরে পাগলই ডাকা উচিত।’

আকবর হাসিমুখে মাথা নেড়ে সায় দেয়।

এভাবে সময় কাটতে থাকে তার। ওদিকে ফুফুর চিন্তা দিন দিন বেড়ে চলে। তিনি যখন থাকবেন না, কে আকবরকে দেখে রাখবে। ফুফু নিঃসন্তান। বিধবাও। এখন আকবরকে নিয়েই তার সংসার, বলা চলে আকবরই তার পৃথিবী। কিন্তু তিনি যখন থাকবেন না, এ ছেলে কী করে সামলাবে সবকিছু ? সবকিছু দূরের কথা, কোনো কিছুই তো সামলাতে পারবে না। এসব কথা মাঝে মাঝে তিনি আকবরকে বলেনও।

‘বাজান, তুই কি কিছু ভাবছস ?’

খাওয়া বন্ধ করে সে ফুফুর দিকে তাকায়, ‘কী ভাবনের কথা কইতেছ ? বয়স তো হইছেই।’

‘তুই বড় হইয়া কী করবি, ঠিক করছস ?’

‘মুক্তিযোদ্ধা হমু, এইটা তো আগেই কইছি।’

‘বাজান, কেমনে তুই মুক্তিযোদ্ধা হইবি, দেশ তো সেই কবেই স্বাধীন হইছে !’

‘হমু। ব্যবস্থা আছে।’

‘মুক্তিযোদ্ধা হইয়া তোর বাপের কী অবস্থা হইছিল, ক !’

‘মুক্তিযোদ্ধা হওয়া মানে দেশের কাজ করা। দেশ তোমারে কিছু না দিল, তুমি দেশেরে কিছু দিলা, এই হইল গিয়া ব্যাপার।’

‘বুঝলাম। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাগোও তো খাওন-পরন লাগে। নাকি ?’

‘তা লাগে।’

‘আমি যখন থাকমু না, তোরে খাওন-পরন কে দিব ?’

‘আবার এই কথা ক্যান কও ! তুমি আবার কই যাইবা ?’

‘তুই তো জানস। জানস না– মানুষরে কই যাইতে হয় ?’

‘জানি। ফুফু, ব্যবস্থা একটা হইবই।’

‘কী ব্যবস্থা হইব ? ক, তুই নিজে কী ভাবছস ?’

‘আমি ভাবি না। ভাবতে গেলে আমি দেখি আমার মাথা গরম হইয়া যায়।’

‘তোরে আমি কিসের মইদ্যে রাইখা যামু, এইটা ভাবলেই আমার বুকের মইদ্যে টনটন করে বাজান।’

আকবর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, ‘তাইলে এক কাজ করমু। তুমি যখন থাকবা না, তখন আমিও থাকমু না।’

‘তুই কই যাবি ?’

আকবর হাসতে আরম্ভ করে। ‘কই যামু, এইটা তুমি ঠিকই বুঝতেছ। বুঝতেছ না ?’

ফুফু দেখা করেন নাসেরুজ্জামানের সঙ্গে। বিলকিস খালার সঙ্গেও কথা হয় তার। আফাজউদ্দিন, শেখ নিয়ামত, আমানুল– এরা আকবরকে স্নেহের চোখে দেখেন। ফুফু তাদের সঙ্গেও কথা বলেন। কেউ কোনো সমাধান দিতে পারেন না। বিলকিস খালা প্রথমে বলেন, 'ফাতেমা, তুমি চিন্তা করবা না, তুমি না থাকলে, আল্লাহ না করুক, আকবরের সব দায়িত্ব আমার।'

শুনে ফাতেমা ফুফু হাসেন। 'আপা, কয়দিন ?'

'কয়দিন না, ফাতেমা, ওরে আমি সব সময়ই দেখমু।'

'তারপর আপনে যখন থাকবেন না ?'

এ কথাটা মাথায় আসেনি বিলকিসের।

'ধরেন, ওর মাথা গোঁজার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কী খাইব, কী পরব ?'

'তুমি ঠিকই কইছ ফাতেমা, এইটা বড়ই চিন্তার কথা।'

এটা নিয়ে আলোচনা হয় নাসেরুজ্জামান, শেখ নিয়ামত এদের সঙ্গেও। সবাই মিলে ঠিক হয়, আকবরকে কোনো একটা কাজ শেখানো হবে।

প্রথমে তাকে পাঠানো হয় ক্ষেতের কাজ শেখার জন্য। আফাজউদ্দিনের কিছু জমিজমা আছে। ওখানে অনেকেই কাজ করে বছরের বিভিন্ন সময় ধরে। আকবর যায় তাদের সঙ্গে কাজ শিখতে। প্রথম কদিন খুব মন দিয়েই কাজ শেখে সে। বাসায় এসে একদিন ফুফুকে বলে, 'ফুফু, এইটা দেখি খুবই সহজ কাজ।'

'না রে বাজান, পৃথিবীর কুনো কাজই সহজ না।'

'কিন্তু আমার কাছে খুবই সহজ লাগতাছে।'

'কাজে ফাঁকি দিতেছস না তো ?'

'কী যে তুমি কও না ফুফু, ফাঁকি দিলে তো আমার নিজেরই অসুবিধা।'

'বাজান, তুই মন দিয়া কাজ শিখ।'

'শিখতেছি ফুফু।'

আকবরের কথা বলার ধরন আর কাজ শেখার আগ্রহ দেখে সবাই ভাবে, এবার ঠিকই আকবরের বুঝি একটা গতি হলো। কৃষিকাজ জানা থাকলে অনেক সুবিধা। কারো না কারো জমিতে কাজ করাই যায়। সারা বছর হয়তো কাজ নেই, তবে বছরের অধিকাংশ সময় কাজ নিয়ে ভাবতে হয় না।

কিন্তু কাজ করতে করতে কিছুদিন পরই কী যে হয় আকবরের, সে কাজে যাওয়া হঠাৎ একদিন বন্ধ করে দেয়। ফুফু প্রথম কয়েক দিন সেটা টের পান না। যেদিন টের পান, সেদিনই জিজ্ঞেস করেন, 'বাজান, তুই নাকি কাজে যাওন বন্ধ করছস !'

আকবর হেসে বলে, 'করছি।'

'ক্যান ?'

'কাজ তো সব শিখ্যা ফেলাইছি।'

'কাজ শিখা এতই সহজ !'

'আমি শিখ্যা ফেলাইছি।'

ফুফু কিছুক্ষণ আকবরের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করেন, 'শিখ্যাই যদি ফালাইছস, আমি যদি ক্ষেতের কাম নিয়া তোরে কয়েকটা প্রশ্ন করি, উত্তর দিতে পারবি ?'

‘হ, পারমু। জিগাও না !’

ফুফু ফাতেমা কয়েকটা প্রশ্ন করেন, আকবর উত্তর দিতে পারে না।

ফুফু বলেন, ‘কাল থেইকা তুই আবার কাজে যাবি, বুঝছস ?’

আকবর পরদিন কাজে যায় ঠিকই, তার পরদিন যায় না। এভাবেই চলতে থাকে। একদিন যায় তো দুদিন যায় না। আবার যেদিন যায় সেদিনও যে খুব মন দিয়ে কাজ করে, তাও না। হয়তো জমির মধ্যে একটু হাঁটাহাঁটি করে একপাশে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিংবা অন্য যারা আছে তাদের সঙ্গে এমন গল্প জুড়ে দেয়, তাদেরই কাজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।

আফাজউদ্দিন এ কথা জানায় সবাইকে। সবার ধারণা হয় ক্ষেতের কাজে সম্ভবত মন বসছে না আকবরের। সুতরাং অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখা যাক।

আকবরকে এবার পাঠানো হয় গরু-ছাগল চরানোর কাজে। ফুফু এবার বলেন, ‘কাল থেইকা তোরে আর ক্ষেতের কাজে যাইতে হইব না।’

আকবরের মুখ হাসিতে ভরে যায়। ‘সেইটা তো আমিও কই। কাজ তো আর কিছুই শিখনের বাকি নাই।’

‘তুই কাল থেইকা গরু চরাইতে যাইবি।’

আকবর অবাক গলায় জিজ্ঞেস করে, ‘গরু পামু কই !’

‘বিলকিস আপার গরু। ছাগলও আছে কয়েকটা। আরো কয়জন যায়, তুইও যাবি।’

আকবর যেতে আরম্ভ করে। প্রথম প্রথম খুবই উৎসাহ তার। ফিরে এসে ফুফুকে নানা গল্প বলে। তবে এ রকম মাত্র কয়েক দিনের জন্য। তারপরই সে কাজ বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ গরু-ছাগল চরাতে আর সে যায় না।

ফুফু অসহায় গলায় জিজ্ঞেস করেন, ‘কী রে, এইবার কী হইল ?’

‘আর কইও না।’

‘কী হইছে ?’

‘এই কাজ তো ভাবছিলাম খুবই সহজ।’

‘তোরে তো কইছি আমি, কোনো কাজই সহজ না।’

‘এইখানে হইছে কি ফুফু– গরু-ছাগলে কথা শুনে না।’

‘কথা শুনে না ?’

‘না। গরুরে কইলাম ডাইনে যাইতে, বাঁয়ে গেল। ছাগলেরে কইলাম সামনে যাইতে, পেছন ফিরা দৌড় দিল। বেয়াদব, যারে কয় বেয়াদব।’

ফুফুর গলা এবার আরো অসহায় শোনায়। ‘আকবর, তুই বুঝতেছস না !’

এরপর আকবর যায় নৌকা গড়ার কাজ শিখতে। কদিন পর জানানো হয়, আকবর যেন না আসে। কারণ সে কাজ শেখে না, শুয়ে শুয়ে নৌকায় করে সমুদ্রে যাওয়ার গল্প করে।

আকবর যায় কাঠের কাজ শিখতে। সেখান থেকেও তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে আরো কয়েক জায়গায় তাকে পাঠানো হয়। হয় সে নিজেই সেসব জায়গায় যাওয়া বন্ধ করে দেয়, নয় ওখানকার লোক তাকে ফেরত পাঠায়।

মুদিদোকানের কথা শুনে আকবরের খুবই উৎসাহ, সে বলে, ‘এদ্দিন পর আসল একটা ব্যবস্থা হইতেছে। পরথমে এইটা হইলেই হইত।’

‘চালাইতে পারবি ?’

‘খুব পারমু।’

সেদিন আরো অনেকেই উপস্থিত। নাসেরুজ্জামান বলেন, ‘আকবর, তোমার ফুফু কিন্তু আগেও তোমাকে কয়েকবার বলেছে পৃথিবীর কোনো কাজই সোজা না।’

আকবর মুচকি হাসে। ‘স্যার, সেইটা তো আমিও বলি।’

‘তুমি মুদিদোকান চালানোর কিছুই কিন্তু জানো না।’

‘খুব জানি।’

‘কীভাবে ?’

‘বাবুল চাচার দোকানে কত কাজ করছি ! সে তো আমারে দেখলেই কইত, আয় আয় আকবর, আয়, আমার লগে একটু হাত লাগা।’

‘আকবর, দোকান চালানো কিন্তু কঠিন কাজ।’

‘জি, খুবই কঠিন।’

‘আবারও ভেবে দেখো, পারবে তো ?’

‘না পারলে স্যার আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।’

আকবরকে দোকান করে দেয়া হয়। দোকানের সাইনবোর্ডে বড় করে লেখা হয়– আকবরের দোকান। আকবর খুব উৎসাহ নিয়ে দোকানে বসতে আরম্ভ করে। তবে দোকান চালানো সত্যিই পরিশ্রমের কাজ। সকালে উঠে আকবর ভাত খেয়ে দোকানে চলে যায়। একটানা দোকান চালায়। দুপুরের দিকে ঝাপ নামায় ঘণ্টাখানেকের জন্য। বাড়ি গিয়ে খেয়েই আবার ফিরে আসে। তারপর যত রাত পর্যন্ত সম্ভব সে দোকান খুলে রাখে। একা মানুষ হিসেবে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়। কেউ কেউ বলে আরেকজন মানুষ রাখার জন্য। কিন্তু তাতে আবার অনেকের আপত্তি। যেমন নাসেরুজ্জামানের। তিনি বলেন, ‘না, ও কষ্ট করা শিখুক।’ তার ফুফুরও ওই এক কথা, যদিও আকবরকে অত কষ্ট করতে দেখে তার মন কাঁদে।

গ্রামের অনেককেই অনুরোধ করা হয়েছে, যেন তারা আকবরের দোকানে কেনাকাটা করে। অনেকে আকবরের দোকানে যায়ও। সে হিসেবে আকবরের লাভই হওয়ার কথা। কিন্তু মাসখানেক পর নাসেরুজ্জামান আর আফাজউদ্দিন হিসাব করতে বসে দেখেন, আকবরের লাভের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। বরং তার পুঁজি থেকেই বেশ কিছুটা অংশ হাওয়া হয়ে গেছে।

আফাজউদ্দিন জিজ্ঞেস করেন, ‘এই ট্যাকা গেল কই আকবর ?’

আকবর বলে, ‘যাইব আর কই, আছে।’

আফাজউদ্দিন বলেন, ‘ঠিক আছে, আছে যে এইটা আমাদের দেখা।’

‘কেমনে দেখামু ?’

‘দোকান চালাস তুই, তুই বুঝবি কেমনে দেখাইবি।’

আকবর দেখানোর চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

নাসেরুজ্জামান জিজ্ঞেস করেন, ‘তুমি কি কাউকে বাকি দিয়েছ ?’

আকবর বিজ্ঞের গলায় বলে, ‘দোকান চালাইতে হইলে বাকি তো দিতেই হয়।’

‘তোমাকে কিন্তু আমি বারবার বাকি দিতে নিষেধ করছিলাম।’

‘তা করছিলেন। কিন্তু স্যার, একটা কথা।’

‘কী কথা?’

‘আছে। শুনেন।’

‘বলো।’

‘স্যার, কইতে পারবেন, মানুষ বাকিতে সওদা করতে চায় কখন?’

‘কখন?’

‘যখন তার নগদে কিননের ক্ষমতা থাকে না।’

‘বুঝলাম। কিন্তু আকবর, তুমি কি একটা ব্যাপার ভেবে দেখছ, তোমার বাকি দেওয়ার ক্ষমতা আছে কি না?’

আকবর চুপ করে থাকে।

‘চুপ করে আছ কেন! আমার প্রশ্নের জবাব দাও।’

‘একটা ব্যাপার স্যার আপনেরে বুঝতে হইব।’

‘বলো।’

‘ধরেন একটা লোক যখন বাকিতে সওদা নিতে আসে, তখন সে খুবই অসহায়। ধরেন, ওই সওদা তার খুবই দরকার, কিন্তু তার পয়সা নাই।’

‘এসব সবাই জানে। কিন্তু তাই বলে বাকি দিতে হবে?’

‘এমন তো হইতে পারে, আমি বাকি না দিলে ওই লোক পরিবার নিয়া না খাইয়া থাকব।’

আফাজউদ্দিন চুপ করে থাকেন, নাসেরুজ্জামানেরও ওই এক অবস্থা, হা করে আকবরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিছুই বলেন না।

আকবর আবার বলে, ‘আর সবাই তো আমার পরিচিতজন, অগো যখন প্রয়োজন পড়ছে তখন আমি বাকি না দিয়া কেমনে থাকি!’

‘ঠিক আছে।’ আফাজউদ্দিন বলেন, ‘বাকি দেস, দে। কিন্তু কার কাছে কত ট্যাকা বাকি পড়ছে, এই হিসাব রাখস?’

আকবর দুপাশে মাথা নাড়ে, অর্থাৎ সে হিসাব রাখেনি।

‘তাইলে তুই বুঝবি ক্যামনে কার কাছে কত পাস?’

আকবর বলে, ‘এইটা আমার বুঝনের কী দরকার!’

‘আশ্চর্য ব্যাপার! তুই হিসাব রাখবি না কে কে বাকি নিল?’

‘আমি রাখি নাই। কী দরকার! কিন্তু যারা যারা বাকি নিছে, তারা তো জানে।’

‘কী জানে?’

‘তারা তো জানে যে তারা বাকি নিছে। তাদের হাতে যখন ট্যাকা আসব তারা তখন বাকি শোধ কইরা দিয়া যাইব। যাইব না?’

মুখে অসহায় হাসি নিয়ে নাসেরুজ্জামান এবং আফাজউদ্দিন পরস্পরের দিকে তাকান।

আকবরের মুদিদোকান তো আর এভাবে টেকার কথা না, টেকেও না। পুঁজিতে টান পড়ে, দোকানে পণ্যের সংখ্যা এক এক করে কমতে থাকে, তারপর একসময় দোকান বন্ধ হয়ে যায়।

আকবরের ফুফু কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'তোরে নিয়া আমি কী করমু ?'

এই প্রশ্নের জবাব অবশ্য ফুফু পান না। কারণ, আকবরের এখন কী হবে, এই প্রশ্নের জবাব হেডমাস্টার নাসেরুজ্জামান, আফাজউদ্দিন, নিয়ামত, আমানুল কিংবা বিলকিস খালা– কারো কাছেই ছিল না। তাকে নিয়ে চেষ্টা তো কম করা হলো না। কিন্তু এর একটাও যদি সফল না হয়, কার কী করার আছে?

নাসেরুজ্জামান বলেন, 'আমাদের বোধহয় আর কিছুই করার নেই। কিন্তু আকবরের কী হবে, এই চিন্তাটা আমাদের থেকেই গেল।'

এই চিন্তা ফুফু, নাসেরুজ্জামানসহ অনেককে কাবু করতে পারলেও আকবরকে কিন্তু একটুও কাবু করতে পারে না। তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের কেউ যদি কখনো ওই প্রশ্ন তোলে, কী হবে তার, সে হাসিমুখে বলে দেয়, 'হইব, দেখবেন।'

আগের মতো নিশ্চিন্ত মনে সে ঘুরে বেড়ায়। বাবুলের দোকানে যায়, নদীর ধারে যায়, খেলার মাঠে যায়, বিলকিস খালার বাসায় যায়, এত দিন বিভিন্ন কাজ শেখার চেষ্টার সুবাদে যাদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, তাদের ওখানে যায়। সে নিশ্চিন্ত গলায় বলে, 'এইবার আবার শান্তি ফির‍্যা পাইছি, হ, উহু রে, ঘুইরা বেড়ানোর মতন মজা আর কিছুতে নাই !'

বিলকিসের বাসায় বড় রকমের এক ডাকাতি হয়ে যায়।

লতিফপুর গ্রামে আগে কখনো ডাকাতি হয়নি। ছোটখাটো চুরি হয়েছে, কিন্তু ডাকাতির ঘটনা এই প্রথম। ঘটনাটা ঘটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কয়েক দিন পরই। ওই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটক লিখে দিতে চেয়েছিল আকবর, অভিনয় করতে চেয়েছিল– ওসব কিছুই তার করা হয়নি, তারপর সে হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবক, শেষে অনুষ্ঠানে সে অপমান করেছিল হাবিবুল্লাহকে।

ওই ঘটনায় কেউ কেউ অবশ্য আকবরের ওপর খুশিও হয়েছিল। বলেছিল, 'জব্বর একখান কাম হইছে।'

তবে এ ধরনের মন্তব্য করার লোক ছিল কম। অধিকাংশের মন্তব্য ছিল অন্যরকম। যেমন :

'পোলায় দেখি খুবই বেয়াদব হইয়া গেছে।'

'হাবিবুল্লাহর মতো লোকরে অপমান !'

'বুঝব, ঠিকই বুঝব। হাবিবুল্লাহ কি ছাইড়া দিব ?'

'আহা, আমাদের গ্রামের মানসম্মান তো আর থাকল না।'

'পাগল পাগল বইলা তারে খুবই ছাড় দেওয়া হইছে।'

'ও এখন যারে কয় ডাকাইতের মতন হইয়া উঠছে। খেয়াল করছ– কেমনে ছুইটা গেছিল !'

এ ঘটনার কয়েক দিন পরই বাসায় ডাকাতি। ডাকাতদের মুখে ছিল মুখোশ, তাদের চেনার কোনো উপায়ই ছিল না। তবে ডাকাতরা সব জানত। বিলকিসের বাসায় কোথায় কী আছে, সব যেন তাদের মুখস্থ। সুতরাং ডাকাতি করে পালিয়ে যেতে তাদের মোটেও বেশি সময় লাগে না।

পুলিশ আসে। বলে, 'ডাকাতির ধরন দেখে মনে হচ্ছে ডাকাতদের মধ্যে এমন কেউ ছিল, যে এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করেছে। এটা হচ্ছে কাছের মানুষের কাজ।'

গ্রামের লোকজন নিজেরাই এসব কথা বলাবলি করছিল। পুলিশ বলার পর তাদের বলাবলির মাত্রা আরো বেড়ে

যায়। কিন্তু পরিচিতজনদের মধ্যে কে হতে পারে ডাকাত দলের সদস্য ?

কারো নাম নির্দিষ্ট করে কেউ বলে না। কারণ তাদের কারো কাছে কোনো প্রমাণ নেই। এর মধ্যেই হঠাৎ করে কীভাবে যেন আকবরের নামটা উঠে এল। কে ওঠাল আকবরের নাম, কে বলল প্রথমে, সেটা কেউ বলতে পারে না, শুধু দেখা গেল একসময় অনেকেই আকবরের নাম বলাবলি করছে।

বিলকিসের বাসায় আকবর ছাড়া অত বেশি কে গেছে ? কে অতবার বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে ? আর, আকবরের স্বভাব-চরিত্রও খেয়াল করতে হবে। হাবিবুল্লাহকে সেদিন মারতে গিয়েছিল না ? সাহস কতটা থাকলে কেউ হাবিবুল্লাহর সঙ্গে ওই ব্যবহার করে ! ডাকাতই যদি না হবে, কোত্থেকে আসে এই সাহস ?

ব্যস, এ-কান ও-কান হয়ে এ কথা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামজুড়ে। একজন বলে, দুজন বলে– এভাবে অনেকেই বলাবলি করতে আরম্ভ করে। কেউ কেউ বিশ্বাসও করে। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করে না। তারা হেসে উড়িয়ে দেয়।

তবে হেসে উড়িয়ে দেয়ার মতো ব্যাপার সেটা থাকে না। দেখা যায় অনেকেই বেশ গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাপারটা বিবেচনা করছে। আকবরের মুখে অবশ্য হাসি। সব শুনে সে হেসে বলে, 'সবাই আমারে পাগল কয়, এখন দেখতাছি এরাই পাগল হইয়া গেছে।'

নাসেরুজ্জামান, আফাজউদ্দিন আকবরকে আড়াল করে রাখেন। বিলকিসও জোর দিয়ে বলেন, 'এ কাজ আকবর করতেই পারে না।'

এর ফলে আকবর সাময়িকভাবে বেঁচে যায়। কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক পরই আবার ডাকাতি হয় গ্রামে। এবার আফাজউদ্দিনের বাড়িতে। একই ধরনে, একই কায়দায়। ধরন দেখে মনে হয় আফাজউদ্দিনের বাড়িতে আসা-যাওয়া আছে, এমন লোক ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। গ্রামের কেউ কেউ বলে, 'আকবরই তো আফাজউদ্দিনের বাড়িতে বেশি যায়।'

এরপর ডাকাতি হয় বাবুলের দোকানে। বাবুল সরাসরি বলে, 'এইটা আকবরের কাজ। সে কুনো সময় আমারে সহ্য করে নাই।'

গ্রামের অনেকেই বাবুলকে সমর্থন করে।

নাসেরুজ্জামান অবাক হয়ে তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কীভাবে এমন একটা কথা বলছ !'

একজন বলে, 'না বলনের কী হইল ! এইটা তো বোঝাই যাইতেছে।'

আরেকজন বলে, 'আকবর হইতেছে মিনমিনা শয়তান।'

অন্য একজন বলে, 'সে দিনের বেলা পাগলের বেশ নিয়া ঘুরে আর রাইতের বেলা ডাকাতি করে।'

আকবরের ফুফু কিন্তু একই রকম প্রতিবাদ করেন, একই রকম বলেন, 'ডাকাতি করব, সে কি কিছু বুঝে ?'

'বুঝে বুঝে, সবই বুঝে।'

'রাইতের বেলা সে বাড়িতে থাকে।'

'তুমি তো এই কথা কইবাই।'

পরপর কয়েকটা ডাকাতির ঘটনায় পুলিশও সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি করে। অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করে আর একদিন এসে আকবরকে ধরে নিয়ে যায়। অবশ্য বেশি দিন রাখে না। দিন পাঁচ-ছয় পর আকবরকে যখন ছাড়ে, তখন তার পুরো পাগল অবস্থা। সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন। পুলিশ কথা বের করার জন্য নানা রকম চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু কোনো কথাই তার মুখ থেকে বের করা যায়নি। তাই ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দেয়ায় গ্রামের অনেকেই অবশ্য খুশি হতে পারেনি। তারা বলে, 'পুলিশ আরো কয়েক ঘা দিলে আকবরের মুখ থেকে কথা ঠিকই বেরিয়ে আসত।'

নাসেরুজ্জামান সপ্তাহখানেকের জন্য ছুটিতে ছিলেন; লতিফপুরের বাইরে। ফিরে এসে যখন শুনতে পান আকবরকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, দেখতে যান আকবরকে। তার সঙ্গে শেখ নিয়ামত, আমানুলসহ আরো অনেকেই। বিছানায় শুয়ে ছিল আকবর। সে উঠে বসে। কারো কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না সে, ফ্যালফ্যাল করে সবার মুখের দিকে তাকায়। তারপর কাঁদতে আরম্ভ করে। কাঁদতে কাঁদতে একসময় বলে, 'সবাই মিল্যা আমারে ডাকাইত বানানোর চেষ্টা করতেছে। বুঝব, একদিন সবাই বুঝব আমি ডাকাইত না, কখনো ডাকাইত না, মুক্তিযোদ্ধার ছেলে।'

গুলিটা বিঁধে আকবরের বুকে। ডাকাত দলকে তাড়া করেছিল সে একা, একজনকে ধরে মাটিতে শুইয়েও ফেলেছিল সে, কিন্তু ডাকাত দলের বাকি সদস্য যারা, দূর থেকে ছোড়া তাদের গুলির একটা এসে বিঁধেছিল আকবরের বুকে।

ডাকাত দল এসেছিল লতিফপুরে। প্রতিবার যেমন নির্বিঘ্নে ডাকাতি সেরে সরে পড়ে তারা, এবার আর সে রকম হয়নি। যেভাবেই হোক গ্রামের লোকজন টের পেয়ে যায়। তাদের অনেকেই বের হয়ে আসে ঘর থেকে। কিন্তু সশস্ত্র ডাকাতদের তাড়া করার সাহস কারো হয়নি। সাহস করে শুধু আকবর।

একাই সে তাড়া করে। ধরেও ফেলে একজনকে। ততক্ষণে আরো অনেকেই চলে আসে তার পেছন পেছন। তার আগেই অবশ্য গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আকবর। যে ডাকাতকে ধরেছিল আকবর, সে পালাতে পারেনি। পেছনে ছুটে আসা গ্রামের লোকজন তাকে বেঁধে ফেলে গামছা দিয়ে। আর বলাবলি করে, 'একজনকে যখন ধরা গেছে তখন বাকিদেরও ধরা যাবে।'

আকবরের কী হয় ?

আকবরকে বাঁচানো যায় না। গ্রামের লোকজন তাকে ঘিরে দাঁড়ায় আর তার প্রশংসা করে। কেউ কেউ ছুটে যায় ডাক্তারের খোঁজে। আকবর অবশ্য বলে, 'আমার সময় শেষ।'

চোখ মুছতে মুছতে নাসেরুজ্জামান তাকে কথা বলতে নিষেধ করেন। বেশি কথা বলেও না আকবর। মৃত্যুর আগে সে শুধু নাসেরুজ্জামানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'স্যার, আমারে কি ডাকাইতের মতো লাগতেছে ?'

নাসেরুজ্জামান ধরা গলায় বলেন, 'না রে পাগল, না।'

'ফুফু, তুমি কী কও ?'

ফুফু কোনো উত্তর না দিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

আকবর জানতে চায়, 'শেষ পর্যন্ত আমারে কি তাইলে মুক্তিযোদ্ধার ছেলের মতো লাগতেছে ?'

কেউ কোনো উত্তর দেয় না। নাসেরুজ্জামান চোখ মুছে বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধার ছেলের মতো না, তোকে আসলে মুক্তিযোদ্ধার মতোই লাগতেছে রে বাজান।'